সন্দেহজনক

বাচ্চু ভট্টাচার্যকে

সূচীপত্র

সন্দেহজনক

সন্দেহজনক শব্দটির মুখোমুখি হলেই আমার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে। এই দ্যাখো, লঘু নিবন্ধের প্রথম পংক্তিতেই গোলমাল করে ফেললাম।

না শ্রীযুক্ত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কোনো সুদূরতম অর্থেও সন্দেহজনক চরিত্রের ব্যক্তি নন। তিনি আমার পুরনো বন্ধু। আমার প্রিয় লেখক। সুরসিক, নিপাট ভদ্রলোক।

'সন্দেহজনক' শব্দটিকে তাঁর বিখ্যাত ভূতের গল্পে তিনি অন্য মাত্রা দিয়েছেন।

ভূত মাত্রেই সন্দেহজনক। শীর্ষেন্দুর গল্পের ভূতও তাই, তার গায়ে গন্ধ আছে। এবং সেই গন্ধটা খুবই 'সন্দেহজনক'। ভূতের ব্যাপারটাও সন্দেহজনক।

অভিধানে সন্দেহ শব্দের অর্থ দেওয়া আছে, 'সংশয়, সত্য সম্পর্কে অনিশ্চিত ভাব।' সন্দেহজনক শব্দের মানে হল, 'সংশয়াত্মক, সন্দেহ উৎপাদক'।

প্রথমে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

এক ভদ্রলোক নিখুঁতভাবে, আইন কানুন মেনে গাড়ি চালাচ্ছেন। হঠাৎ, ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট এসে গাড়ির পাশে মোটর সাইকেল দাঁড় করালেন।

উদ্বিগ্ন চালক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?'

গম্ভীর মুখে সার্জেন্ট বললেন, 'দেখি আপনার লাইসেন্স?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? আমি কি কোনো ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করেছি?'

সার্জেন্ট বললেন, 'না।'

ভদ্রলোক চিন্তিত হলেন, আবার প্রশ্ন করলেন, 'গাড়ির নম্বর, আলো এসবের গোলমাল আছে? গাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে?'

সার্জেন্ট বললেন, 'না।'

ভদ্রলোক এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'সব আইন মেনে, নিয়ম মেনে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছি আর আপনি আমার কাছে লাইসেন্স দেখতে চাইছেন?'

পুলিশোচিত মসৃণ মুখে সার্জেন্ট এবার বললেন, 'সেই জন্যেই তো সন্দেহ হচ্ছে আপনার নিশ্চয় লাইসেন্স নেই। লাইসেন্স থাকলে এত সাবধানে, সব আইন মেনে কেউ চলে না।'

এর পরে কী হয়েছিল, ভদ্রলোক লাইসেন্সধারী ছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কিন্তু সার্জেন্ট সাহেবের সন্দেহের কারণ অমূলক ছিল না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এবার আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি।

বহুদিন আগের কথা। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর হবে। তখনকার ধর্মতলা স্ট্রিট ছিল, বিশেষ করে এসপ্ল্যানেড থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত, কলকাতার সবচেয়ে রমরমা অঞ্চল। সন্ধ্যাবেলা আলোকিত দোকানমালা, কেনাকাটা, লোকজন। ধর্মতলা জমজমাট।

আমি থাকতাম এসপ্ল্যানেডের এক গলিতে, আত্মীয়ের বাসায় সরকারি কোয়ার্টারে। সন্ধ্যাবেলা কলেজ থেকে ফিরে একটু বিশ্রাম করে হাঁটতে বেরোতাম। এসপ্ল্যানেডের মোড় থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার অর্থাৎ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার অবধি।

ওই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের একপাশে ছিল বৌবাজার অ্যাথলেটিক ক্লাব। সেখানে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় বক্সিং চর্চা হত। আমি কখনো কখনো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই ঘুষি-যুদ্ধ দেখতাম, আমার মতো আরো অনেকেই ফুটপাথে তারের বেড়ার জালে দাঁড়িয়ে এই ঘুষোঘুষি প্রত্যক্ষ করতেন, তারিফ করতেন, দুয়ো দিতেন।

অল্প দিনের মধ্যে আমার নজরে আসে যে সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট পরা এক বছর তিরিশের যুবক প্রতি দিনই দাঁড়িয়ে এই খেলা দেখেন আর মোক্ষম মুহূর্তে চেঁচাতে থাকেন, 'আরো, আরো মারো, চোয়ালে মারো, চোয়ালে মেরে দাঁত ভেঙে দাও।'

কয়েকদিন দেখার পরে বুঝলাম, ভদ্রলোক ঠিক কোনো পক্ষে নন, যখনই যে বেকায়দায় পড়ে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে চোয়ালে আঘাত করে দাঁত ভেঙে দিতে উৎসাহ দেন। ব্যাপারটা কী ? এই ভদ্রলোকের এইরকম আগ্রহের কারণ কী ? আমার কেমন খটকা লাগল।

এক সন্ধ্যায় মুষ্টিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে পাশাপাশি হাঁটছি, আমি হঠাৎ সন্দেহবশত কোনোরকম না ভেবেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা আপনি প্রত্যেকদিনই দু'পক্ষকেই দাঁত ভেঙে দিতে উৎসাহ দেন কেন ?'

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি লক্ষ্য করেছেন ?

আসুন আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।'

রাস্তার ওপারেই সেকালের স্যাঙ্গুভ্যালি রেস্টুরেন্ট। সেখানে গিয়ে তিনি দু কাপ চা অর্ডার দিলেন, একটা ছয় কোণাচে পাথরের টেবিলের দু'পাশে আমরা মুখোমুখি বসলাম।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'দেখুন আমি একজন নতুন ডেন্টিস্ট। সদ্য পাশ করেছি। এই পাশের রাস্তাতেই আমার চেম্বার। কিন্তু রোগীর দেখা নেই। সারা সন্ধ্যা আলো জ্বালিয়ে হন্যে হয়ে বসে থাকি। তাই একেক সময় বেরিয়ে বক্সিং দেখতে আসি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু!'

ডেন্টিস্ট বললেন, 'হ্যাঁ, এবার আপনার কিন্তুর কথা বলি, ওই যে আমি চেঁচাই, 'মারো মারো, চোয়ালে মেরে দাঁত ভেঙে দাও। এই ভাবে যদি দাঁতের রোগী কিছু বাড়ে সেই আশায় চেঁচাই।'

পরে ভদ্রলোকের খুবই ভাল পশার হয়েছিল কিন্তু বক্সিংয়ে দাঁত ভাঙার রোগী একটাও পাননি। আমার কাছে একদিন কবুল করেছিলেন, 'শুধু-শুধু চেঁচাতাম।'

পথে পথে কবিতা

কলকাতাকে অনেক সময় কবিতার শহর বলা হয়। বিশেষ করে পঁচিশে বৈশাখের আগে ও পরে বেশ কয়েকদিন রবীন্দ্রসদন ও আশেপাশে কবির হাট বসে যায়, কবিতার মেলা।

কলকাতার মতো এত কবি বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো শহরে নেই। পঁচিশে বৈশাখে বা পুজোর সময় শহর ও শহরতলি থেকে যে পরিমাণ কবিতার কাগজ বের হয়, বই মেলার সময় যে সংখ্যক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় অন্যান্য ভাষার কবিবৃন্দ তা শুনলে অবাক হয়ে যান, এ সব তাঁদের কল্পনার অতীত।

অবশ্য প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় কবিতা উৎসবে ঢাকা শহর যেভাবে

মেতে ওঠে তার কোনো তুলনা হয় না। কবিতা উৎসবের অব্যবহিত পরে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে আমজনতা যে ভাবে অংশগ্রহণ করে, কবিতার ছন্দে-তালে-লয়ে একটা প্রাচীন নগরী যে রকম আলোকিত হয়, পৃথিবীতে কোথাও সম্ভবত তার তুলনা নেই।

তবে কবিতার ব্যাপারে একদিক থেকে মেক্সিকো শহর সারা পৃথিবীকে টেক্কা দিয়েছে।

আমরা ইংরেজি বানান দেখে বলি মেক্সিকো। মেক্সিকো দেশের রাজধানী মেক্সিকো নগর। পৃথিবীর বৃহত্তম নগরগুলির প্রথম সারিতে মেক্সিকো।

মেক্সিকোর লোকেরা কিন্তু তাদের দেশ বা শহরকে মেক্সিকো বলে না। স্থানীয় উচ্চারণে মেক্সিকো হল মেহিকো। মার্কিনীরাও দেখলাম মেক্সিকানদের বলে মেহিকান।

সে যা হোক, মেহিকো বা মেহিকান নয়, আমরা মেক্সিকো বা মেক্সিকান বলব।

মেক্সিকোর লোকেরাও কিন্তু ঠিক আমাদের কলকাতা বা ঢাকা শহরের মতো ভাবেন যে তাদের শহরও কবিতার শহর।

মেক্সিকোর কবি অক্তাভিয়ো পাজ সাহিত্যে নোবেল জয়ী। তিনি একদা ভারতে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

কিন্তু এরকম নোবেলজয়ী বা তদনুরূপ জগৎ বিখ্যাত কবি জগৎ সংসারের বহু শহরেই আছেন। তার জন্য নয়, আসলে কবিতা ছড়িয়ে আছে মেক্সিকোর রাস্তায় রাস্তায়, এই শহরের রাজপথগুলির নামকরণে।

মেক্সিকোর পাশেই মার্কিন দেশ। সেখানে নিউইয়র্ক শহরের প্রধান অঞ্চলে রাস্তার নামকরণ নম্বর দিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে ইস্ট এবং ওয়েস্ট স্ট্রিট। আর উত্তর দক্ষিণে এভিনিউ তৃতীয় এভিনিউ পঞ্চম এভিনিউ ইত্যাদি। দুয়েকটি এভিনিউয়ের সঙ্গে লোকনায়ক, সেনাপতি, বিখ্যাত ব্যক্তি এদের নাম জড়িত, যেমন ম্যাডিসন এভিনিউ, লেক্সিংটন এভিনিউ। আমি একবার ডোরালস ইন নামে একটা হোটেলে ছিলাম, ঠিকানা ছিল ফরটি নাইনথ অন লেক্সিংটন, অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ নম্বর রাস্তা এবং লেক্সিংটন এভিনিউয়ের মোড়।

মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটনেও রাস্তার নাম অনেক অংশেই নম্বর দিয়ে। আমাদের সল্টলেক উপনগরীতেও সম্প্রতি নম্বর দিয়ে নামকরণ চালু হয়েছে।

এবার মেক্সিকোর রাস্তার নামকরণে আসি। এই শহরটি বাড়ছে তো বাড়ছেই, কলকাতার মতো ক্রমাগত ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ শতকের গোড়ায় মেক্সিকো নগরে অধিবাসী ছিল লাখ দশেক। এখন অধিবাসী সংখ্যা প্রায় দু কোটি।

নতুন জনপদ, নতুন শহরতলি বাড়ছে। বাড়ছে রাস্তা। এতসব রাস্তার নতুন

নাম দেওয়া সোজা কাজ নয়। সেনাপতিদের নাম, রাষ্ট্রনায়কদের নাম, মহাপুরুষ বা গণ্যমান্যদের তালিকা সব ফুরিয়ে গেছে। ফলে এখন রাস্তার নাম রাখতে গিয়ে পুর কর্তৃপক্ষকে অন্যরকম ভাবতে হচ্ছে।

মেক্সিকোর নাগরিকরা এখন যেসব রাস্তায় বসবাস করেন, কাজকর্ম করেন, বাজারহাট করেন তার অনেকগুলির নাম এই রকম :

আলোর অরণ্য, জলের আয়না, স্মৃতির উদ্যান, স্বপনের সমুদ্র।

এই রকম অসংখ্য সব নাম। রহস্য বনানী এবং অলৌকিক অরণ্য কাছাকাছি দুটি রাস্তা। আশাপথ গিয়ে শেষ হয়েছে সৌভাগ্য সরণিতে।

শুধু এই নয়।

পৃথিবীর মানচিত্র একাকার হয়ে গেছে মেক্সিকোর রাজপথে। হিমালয় পর্বত নেমেছে আল্পস পাহাড়ে। রাশিয়ার ভলগা নদী মিশে গেছে মিশরের নীলনদে।

কাব্য ও কল্পনার, বাস্তব ও অলৌকিকের সমাহার ঘটেছে এই সব রাস্তার নামকরণে।

যত রকম ফুল আছে, পাখি আছে, বিচিত্র উদ্ভিদ আছে, রাশি-নক্ষত্রেরা আছে, রূপকথার উপকথার চরিত্রেরা আছে—কে নেই মেক্সিকোর রাস্তায়।

আছেন কালজয়ী লেখক এবং কবিবৃন্দ, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা। ভিক্টর হুগো স্ট্রিটকে কেটে বেরিয়ে গেছে শেক্সপিয়ার সরণি। বেটোফেন গিয়ে পড়েছে বাখে।

আছেন টলস্টয় এবং দান্তে, ডিকেনস্ এবং মলেয়ার, সক্রেটিস এবং ডারউইন।

এর পরেও আছে বছরের প্রত্যেকটি মাসের নামে এককেটি রাস্তা, জানুয়ারি মার্গ থেকে ডিসেম্বর মার্গ।

এত সবের পরেও যখন জনাকীর্ণ একটি আধুনিক শহরের রাজপথে পৌঁছে দেখি রাস্তার নাম 'ধানের খেত' কিংবা 'গমের পথ', একটু থামতে হয় বৈকি। কারণ একটু সামনেই কবুতর সরণিতে আমার বাল্যবন্ধু ইয়াসিন থাকে, শালিকডাঙার হোটেল থেকে তার ওখানেই যাচ্ছি নৈশ আহারে।

ভোজনবিলাস

কচুপোড়া জিনিসটা কি রকম খেতে সে আমি বলতে পারবো না। নিশ্চয়ই খুব অখাদ্য, নিকৃষ্ট জাতের খাদ্যদ্রব্য, তা না হলে লোক সমাজে 'কচুপোড়া খাও', 'যত সব কচুপোড়া' ইত্যাদি কথা প্রচলিত রয়েছে কেন?

কিন্তু কচু ভাজা? জেনে কিংবা না জেনে আমরা অনেকেই খাই। বাজারে প্লাস্টিকের প্যাকেটে পটাটো চিপসের মতোই কচুভাজা বিক্রি হয়। একটু কম দাম। তবে ঝাল-ঝাল মুচমুচে। বোধহয় কচুর স্বাদটা ঢাকা দেওয়ার জন্যই ঝালমশলা একটু বেশি। তবে সচেতন খাদকের পটাটো চিপসের সঙ্গে কচুভাজার পার্থক্য টের পাওয়া কঠিন নয়।

শুধু স্বাদের ব্যতিক্রম তাই নয়। প্যাকেটের কচুভাজা পটাটো চিপসের মতো ফুরফুরে নয়, মসৃণ নয়। খাবারটা মোটা দাগের।

কিন্তু এ তো গেল, প্যাকেটের কচুভাজা। আমি যে কচুভাজার কথা স্মরণ করছি, স্বাদে গন্ধে সে কচুভাজার স্বাদ অনুপম।

আমি মানকচু ভাজার কথা বলছি। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র একদা এক গোলমেলে ব্যক্তিকে মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন, সেই মানপত্রটি ছিল মানকচুর পাতা।

আমি অবশ্য মানকচু ভাজার কথা পরিহাস করে বলছি না।

আমার কাছে ভাজার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল মানকচু ভাজা। সাহেবদের দেশে পটাটো চিপস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই (তেলে ডোবানো আলু ভাজা), ফিস অ্যাণ্ড চিপস (আলুর টুকরোর সঙ্গে মাছের টুকরো ভাজা) খেয়েছি। আমাদের দেশে তো চানাচুর থেকে হরেক রকম সাড়ে বত্রিশ ভাজা। রান্না ঘরে আলু, বেগুন, কুমড়ো, পটল, ফুলকপি, সাদাসিধাভাবে কিংবা কালোজিরে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ভাজা অথবা ব্যাসন দিয়ে মুচমুচে করে ভাজা, একেকটার একেকরকম স্বাদ। এ ছাড়া আছে মাছ ভাজা, ডিম ভাজা। একদা আমিনিয়ায় চিকেন ভাজা খেয়েছি, কফি হাউসে পকৌড়া খেয়েছি,

জ্ঞানবাবুর দোকানে ভেটকি মাছের ফ্রাই খেয়েছি।

এই সব কিছুই স্মরণে রেখে বলছি, হলফ করে বলছি মানকচু ভাজার মতো সুস্বাদু, নিষ্কলুষ, মুখরোচক খাবার খুব একটা খাইনি।

আজকাল তো পত্র-পত্রিকার মধ্যে রন্ধনশালা ঢুকে পড়েছে, বিচিত্র সব উপাদেয় খাদ্যের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া বিশদে এবং লোভনীয়ভাবে বর্ণিত হচ্ছে। দূরদর্শনের পর্দাতেও রসনা সিক্ত করা রন্ধনের সমারোহ।

আমি না হয় একটু অনধিকার চর্চা করি, মানকচু ভাজার কথা বলি।

প্রমাণ সাইজের তেমন তেমন মানকচু ওপরের পাতা বাদ দিয়ে গোড়াটা মানে কচুর অংশটা এক মানুষ সাইজের লম্বা হয়। তারই মাঝামাঝি থেকে ইঞ্চি চারেকের একটা টুকরো কেটে নিতে হবে। সাত আট ইঞ্চির ব্যাসের মানকচুর এই রকম একটি খণ্ডের ওজন কমপক্ষে এক কেজি।

সে যা হোক এবার এই মানকচুকে খোসা ছাড়িয়ে জিরে কাটা সুপুরির মতো লম্বা ফালি ফালি করতে হবে। এর পর ভাল করে ধুতে হবে। জলে ডুবিয়ে রেখে ভাল করে ধোয়া এইজন্য প্রয়োজন যে অনেক মানকচুর মধ্যে কষায় ভাব থাকে যার জন্য গলা চুলকোয়।

এর পর অল্প হলুদ আর নুন মাখিয়ে রৌদ্রে শুকোতে হবে। চার পাঁচদিন টানা রোদ্দুর না হলে সম্পূর্ণ জলমুক্ত হয়ে ঝরঝরে হবে না। এইবার টগবগে সরষের তেলে ভাল করে চুবিয়ে ভেজে নিতে হবে। ভাতের পাতে ডালের সঙ্গে এর চেয়ে মুচমুচে, এর চেয়ে উপাদেয় আর কোনও ভাজা হতে পারে না।

মানকচু ভাজার ব্যাপারটা গঙ্গারামের পছন্দ হয়নি। মোগলাই পরোটা এবং কষা মাংসের জন্যে বিখ্যাত একটি রেস্তোরাঁয় দুজনে মুখোমুখি বসে খাচ্ছিলাম। গঙ্গারাম বলল, 'আচ্ছা আপনি যে কচুভাজা, ঘেঁচুসেদ্ধ থেকে মাংস পোলাও পর্যন্ত সুযোগ পেলেই আপনার লেখায় নিয়ে আসেন, কেন? খাবার দাবার নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন?'

আমি চুপ করে রইলাম।

গঙ্গারাম বলল, 'গরু-বাছুর, কুকুর-বেড়াল তারাও তো খায়-দায়। তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কি?'

এবারো আমি চুপ।

গঙ্গারাম বলল, 'পার্থক্য একটাই। খেয়েদেয়ে তাদের পয়সা দিতে হয় না। আমাদের দিতে হয়। ওই তো বেয়ারা এসে গেছে। এবার খাওয়ার পয়সাটা দিয়ে দিন তো?'
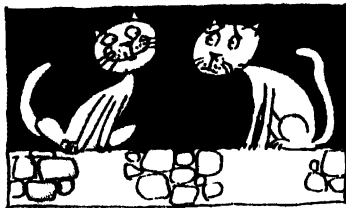
জীবে দয়া করে যেই জন

আজকাল তো প্রায় সব দীর্ঘ ঈ-কার হ্রস্ব ই হয়ে গেছে, কিন্তু যে যুগে এমন ছিল না, যখন বাড়ি কিংবা পাখি বানানেও দীর্ঘ ঈ-কার দেয়া নিয়মবিরুদ্ধ ছিল না সেই কালে মহাত্মা শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন,

'জিবে দয়া করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

বলা বাহুল্য, এটা মোটেই বানান ভুল নয় বরং একটি অতি উচ্চমানের শিবরামীয় রসিকতা। এই জিব প্রাণী নয়, এ হল জিহ্বা বা রসনা। লজ্জায় ওই জিব আমরা কাটি, লোভে এই জিবে আমাদের জল আসে।

স্বভাব রসিক, খাদ্যপ্রেমিক শিবরাম জিবে দয়া বলতে রসনাকে তৃপ্ত করার কথা বলেছেন। দই-রাবড়ি থেকে চপ কাটলেট তিনি ভালবাসতেন তেলেভাজা, ফুচকা পর্যন্ত। এবং পরিণত বয়সেও তাঁকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একা এসব খেতে দেখা গেছে।

এবার জিব থেকে জীবে যাই।

বেড়ালের দুটো গল্প আছে, সে দুটো এখন আরেকবার বলি।

এক ভদ্রমহিলার বেড়াল বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। বেড়ালদের পালিয়ে যাওয়া একটা অভ্যেস, তারা এরকম করে, তাদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

এদিকে মহিলার বেড়াল-অন্ত প্রাণ। পলাতক বেড়ালের শোকে উথাল-পাথাল করছেন। আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, 'বেড়ালের বর্ণনা দিয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন না।'

মহিলা বললেন, 'আমার বেড়াল তো লেখাপড়া জানে না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কি লাভ হবে?'

এরপর ওই অশিক্ষিত বেড়ালের আরেকটি গল্প।

বেড়ালদের নিয়মমতো যথাসময়ে ওই বেড়ালটি মালকিনের কাছে ফিরে এসেছে। ভদ্রমহিলা তো খুব খুশি। তিনি শখ করে বাজারে গেলেন বাসনপট্টি

থেকে বেড়ালের একটা কাঁসার বাটি কেনার জন্যে।

সুন্দর বাটি পাওয়া গেল। মহিলা দোকানিকে বললেন, 'এটা কিনছি আমার বেড়াল তরঙ্গিনীর জন্য।' শুনে দোকানদার বললেন, 'তা হলে বাটির গায়ে তরঙ্গিনী নামটা লিখিয়ে দিই।'

ভদ্রমহিলা আবার সেই একই আপত্তি জানালেন, 'না। তরঙ্গিনীর নাম লিখে লাভ নেই, ও তো আর পড়তে জানে না।'

পুনশ্চ :

এই শেষ অংশটি দ্বিভাষাতত্ত্ব নিয়ে। দুটো ভাষা ভালভাবে জানা থাকলে কি সুবিধে হয় সেটা এই গল্প পড়লে পরিষ্কার জানা যাবে।

একটা সরু গলির মধ্য দিয়ে দুটো বেড়াল যাচ্ছিল। হঠাৎ গোটা কয়েক কুকুর তাদের ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে আসে।

কুকুরের তাড়া খেয়ে একটা বেড়াল লাফ দিয়ে পাশের বাড়ির দেয়ালের ওপরে উঠে গেল। দ্বিতীয় বেড়ালটিকে ততক্ষণে কুকুরগুলি ঘিরে ধরেছে। দ্বিতীয় বেড়ালটি এই আকস্মিক বিপদে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে রুখে দাঁড়াল। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। একেবারে বিশুদ্ধ খেঁকি কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে গর্জন করতে থাকল।

বেড়ালের মুখে এই কুকুরের ডাক শুনে কুকুরগুলি ঘাবড়িয়ে গেল। অবশেষে পিছু হটে গেল।

এবার দ্বিতীয় বেড়ালটি ধীরে সুস্থে পাশের বাড়িতে দেয়ালের ওপর উঠে সন্ত্রস্ত প্রথম বেড়ালটিকে বলল, 'দেখলি তো, দুটো ভাষা ভালো জানার কত সুবিধে।'

লণ্ঠন
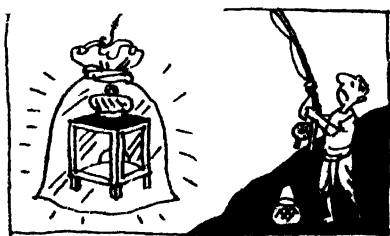
লণ্ঠন শব্দটি বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ইংরেজি ল্যানটার্ন থেকে এসেছে। মূল শব্দটি লাতিন ল্যানটার্না। এই লণ্ঠনের আলোতেই উনিশ শতকে ঝাড়বাতি ঝাড়লণ্ঠন হয়ে গেছে।

আমাদের পূর্ববঙ্গে অবশ্য লণ্ঠনের চেয়ে বেশি চল ছিল হ্যারিকেন শব্দের। হ্যারিকেন অথবা হারিকেন ঘণ্টায় শোয়াশো কিংবা তারও বেশি গতিবেগের সমুদ্রের ঝড়। শব্দটি সম্ভবত স্প্যানিশ।

পুরো শব্দটি হল হ্যারিকেন লণ্ঠন। ইংরেজি এবং স্প্যানিশ দুটি ইউরোপীয় ভাষার দুটি শব্দ একত্রিত হয়েছে বাংলায়। সমুদ্র বক্ষে দুর্দান্ত হ্যারিকেন ঘূর্ণাবত্যার মধ্যে যে লণ্ঠন জ্বলে তারই নাম হ্যারিকেন লণ্ঠন।

আমিও ছোটবেলায় দেখেছি বিশাল নদীতে ছইহীন মাছ ধরার নৌকোয় মাঝিরা ঝড়জলে লণ্ঠনের ওপরেই ভরসা করে। তবে মধ্য নদীতে কতটুকু আলোরই বা প্রয়োজন পড়ে, যে প্রয়োজন ঘটে ঘাটে নৌকো ভেড়ানোর পর দিনের আলো না থাকলে। অন্য সময় লণ্ঠন থাকে পাটাতনের নিচে।

আঠারোশো পঞ্চাশ থেকে ঊনিশশো পঞ্চাশ, এই একশো বছর ছিল লণ্ঠনের যুগ। খুবই রমরমা ছিল এরই মাঝামাঝি পঞ্চাশ-ষাট বছর।

কত রকমের যে লণ্ঠন ছিল। বড় লণ্ঠন, জুম লণ্ঠন, গোল লণ্ঠন, ছোট লণ্ঠন, আরো ছোট লণ্ঠন। চার ইঞ্চি উচ্চতার ক্ষুদ্রাকার লণ্ঠন যেমন দেখেছি, তেমনিই দেখেছি আড়াই সেরি গোল লণ্ঠন যাতে আড়াই সের কেরোসিন লাগত, প্রায় হ্যাজাকের মতো উজ্জ্বল আলো হতো।

লণ্ঠনের পাশাপাশি এলো কাগজের চিনে লণ্ঠন। এখনো বড়দিনের সময় নিউ মার্কেট এলাকায় কিনতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া ফানুস লণ্ঠন, সে লণ্ঠনের আলোয় আকাশপথ আলোকিত হতো।

আকাশ প্রদীপের বাতি হাওয়ায় নিবে যায় বলে এই কলকাতা শহরেই আকাশ প্রদীপ হয়ে ছোট লণ্ঠন জ্বলতে দেখেছি, এই সেদিনও চেতলার এক বাড়িতে।

এই পর্যন্ত লিখেছি এমন সময় গঙ্গারাম এলে লেখাটায় এক পলক চোখ বুলিয়ে দেখে বলল, 'দাদা, একেবারে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিলেন?' 'হাতে লণ্ঠন' ব্যাপারটা খারাপ কেন জানি না, কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় দেশগাঁয়েও শুনেছি, কোনও হতভাগ্য সম্পর্কে উক্তি, 'লোকটার একেবারে হাতে হ্যারিকেন হয়ে গেছে হে।'

আপাতত গঙ্গারাম মাথায় থাক।

এবার আসল লণ্ঠনের গল্প বলি। এ লণ্ঠন ওয়াটার প্রুফ। ওয়াটার প্রুফ ঘড়ি যেমন জলে ডুবলেও বন্ধ হয় না, তেমনিই এ লণ্ঠন জলে ডুবলেও নেবে না।

দুই মৎসশিকারির গল্প। মতিলাল আর রতিলাল, খুড়ো-ভাইপো।

এক বর্ষার সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে গল্প করতে করতে খুড়ো বললেন, 'তোরা আর কি মাছ ধরিস। জানিস তোদের বয়সে দেশের বাড়িতে চলন বিলে নৌকা থেকে বঁড়শি ফেলে আমি একটা পাঁচ মণ বোয়াল মাছ ধরেছিলাম। খেলিয়ে খেলিয়ে

ঘাটে এনে সেটাকে পারে তুলতে আট দশজন লোক লেগেছিল।'

ভাইপো তখন মনে মনে হিসেব করছে, পাঁচ মণ মানে দুশো সের, মানে অন্তত পৌনে দু কুইন্টাল মানে একশো পঁচাত্তর কেজির বেশি হবে। অসম্ভব। অবশ্য অসম্ভব। ভাইপোকে চিন্তারত দেখে খুড়ো বললেন, 'বুঝলি না, একটা বড় হাঙরের সমান। বোয়াল মাছ তো, প্রথম দেখে হাঙরই মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই উত্তরবঙ্গে চলন বিলে হাঙর আসবে কোথা থেকে?'

ভাইপো রতিলাল তখন বলল, 'এবার তাহলে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। কোলাঘাটে নদীর ধার থেকে একটা খাল মতো বেরিয়েছে। সেখানে একবার ছিপ ফেলেছি। তা বঁড়শিতে মাছ ছাড়া কত কি ওঠে, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ঝাঁটা, গাছের ডাল। সেদিন ছিপে উঠল একটা মুখ বাঁধা প্লাস্টিকের প্যাকেট। দেখি তার মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের গায়ে একটা চিরকুট লাগানো, দিন সাতেক আগের তারিখ দেয়া। সেই চিরকুটে লেখা আছে, 'এই লণ্ঠন নিভাইতে না পারিয়া জলে ফেলিয়া দিলাম।'

খুড়ো মশায় আর সইতে পারলেন না, ভাইপোকে বললেন, 'ওরে রতি তুই লণ্ঠনটা নেবা। আমি আমার মাছটাকে পাঁচমণ থেকে আড়াই মণ করে দিচ্ছি।'

অপ্রাসঙ্গিক

প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিকের মধ্যে সূক্ষ্ম রেখাটা কোথায় সেটা সব সময় চোখে পড়ে না। বস্তুত কোথায় যে কি প্রাসঙ্গিক আর কি অপ্রাসঙ্গিক সেটা বোঝা সহজ নয়।

শিরে সর্পাঘাতে এক ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছিল। এ কথা শুনে তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোক নাকি মন্তব্য করেছিলেন, 'তবু রক্ষা, মাথায় ছোবল না মেরে সাপ যদি ছোবল মারত চক্ষুতে। চক্ষু দুটি নষ্ট হয়ে যেত, চক্ষুরত্ন পরম রত্ন।' মৃত ব্যক্তির যে পরম রত্নের আর প্রয়োজন নেই, কে তাকে বোঝাবে। এই লোকটি সত্যিই বেকুব। প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গের উদ্ভট পুরনো গল্পটি ছিল এইরকমই এক বেকুবের

কাহিনী।

সে কালের শ্রাদ্ধবাসরে আজকালের মতো এত গানবাজনা, কীর্তন, ভক্তিগীতি হত না। বড় জোর গীতাপাঠ হত।

তা, পাড়াগেঁয়ে রাস্তা দিয়ে এক পথিক যাচ্ছেন, তিনি সম্ভবত আমাদের এই পূর্বোক্ত বেকুব।

তিনি দেখলেন পথের পাশে একটা বড় বাড়িতে বিশাল ব্যাপার হচ্ছে। বড় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, লোকজন গমগম করছে, উঠোনে বড় বড় উনুন কেটে রান্না হচ্ছে, বিরাট সব হাঁড়ি কড়াই।

কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পথিক ব্যাপারের বাড়ির সামনে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত বড় ব্যাপার হচ্ছে? কিন্তু সানাই-নহবত, ব্যান্ডপার্টি কিছু দেখছি না।'

সেই ব্যক্তি গম্ভীরভাবে বললেন, 'এখানে শ্রাদ্ধ হচ্ছে।'

পথিকের প্রশ্ন, 'কার শ্রাদ্ধ?'

উত্তরদাতা কিঞ্চিৎ দূরে সামিয়ানার সামনে দণ্ডায়মান মুণ্ডিত মস্তক নতুন ধুতিচাদর পরা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে দেখছেন ন্যাড়া মাথা....'

ভদ্রলোক কথাটা শেষ করতে পারলেন না, তার আগেই বেকুব লুফে নিলেন, 'ও বুঝতে পেরেছি ওঁরই শ্রাদ্ধ হচ্ছে।'

উত্তরদাতা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'সে কি করে সম্ভব? ওই ন্যাড়ামাথা ভদ্রলোকের বাবার শ্রাদ্ধ।'

এর পরের প্রশ্ন আরও ভয়াবহ, প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিকের সীমানা ছাড়িয়ে, 'তা যাঁর শ্রাদ্ধ, তিনি কোথায়?'

উত্তরদাতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তিনি আর কোথায়? তিনি মারা গেছেন বলেই এই শ্রাদ্ধ।'

ওষ্ঠ ও জিহ্বার সংযোগে দুবার চুকচুক করে বেকুব বললেন, 'আহা, নিজের শ্রাদ্ধ নিজে দেখে যেতে পারলেন না। আহা।'

সম্ভবত এই বিখ্যাত বেকুবই যখন জানতে পেরেছিলেন যে গৃহকর্তা শিরে সর্পাঘাতে মারা গেছেন তখন চোখে সাপ ছোবল না দেওয়ায় 'চক্ষুরত্ন পরমরত্ন' বলেছিলেন। এবং চোখ বেঁচে যাওয়ায় আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কাণ্ডজ্ঞানহীন এই বেকুবকাহিনী অপ্রাসঙ্গিকে টেনে আনা জুতসই হল না। দুয়েকটা অন্য গল্প বলি।

বাচ্চা ছেলে তিনতলায় ফ্ল্যাট থেকে জানলা দিয়ে বাবার ঘড়ি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে। বাবা ধীরে সুস্থে চপ্পল পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন রাস্তা

থেকে ঘড়িটা উদ্ধার করতে।

বাচ্চার মা বললেন, 'তাড়াতাড়ি ছুটে যাও। ছুটে গিয়ে ঘড়িটা তুলে আনো। রাস্তায় ঘড়িটা বেশিক্ষণ পড়ে থাকবে না।'

বাচ্চার বাবা বললেন, 'আমি বোকা নই। ঘড়িটা পনেরো মিনিট লেট। ঘড়িটা নিচে পৌঁছানোর আগেই আমি পৌঁছে যাব।'

দ্বিতীয় গল্প, বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে।

পার্কের এক পাশে অল্পবয়েসী বিবাহিতাদের জটলা। প্রায় সবাই বলছে তার বয়ফ্রেণ্ড আছে, কেউ কেউ একাধিক ফ্রেণ্ডের দাবি করছে।

একটি নতুন বৌ চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে কিছু বলছিল না। সবাই চেপে ধরায় সে বলল, 'ওর একজন বয়ফ্রেণ্ড ছিল, এখন নেই।' কি হল সেই বয়ফ্রেণ্ডের? অন্য কোথাও চলে গেছে? মরে গেছে? নতুন বৌটি বলল, 'না সেসব কিছু নয়, তার বিয়ে হয়ে গেছে।' এবার প্রশ্ন উঠল, 'কোথায়, কার সঙ্গে বিয়ে হল?' নতুন বৌ চোখ নামিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে।'

পুনশ্চ :

কোনও অজ্ঞাত কারণে, হয়তো তার কথা নিয়মিত লেখা হচ্ছে না বলে গঙ্গারাম আজ কিছুদিন খুব নিরুত্তাপ। সে বলল, 'আমি একটা অপ্রাসঙ্গিক গল্প বলি।'

আমি আর কি বলব, বললাম, 'বলো।'

গঙ্গারাম বলল, 'আমার চার বছরের ছেলে সেদিন তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি যখন জন্মেছিলাম, তুমি কোথায় ছিলে? তার মা বলল, নার্সিংহোমে। ছেলে মাকে বলল, তা হলে তুমি বাসায় এসে আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে!'

উলটো পালটা

উল্টা-পুল্টা নামে এক হিন্দি কমিক সিরিয়াল সম্প্রতি দূরদর্শনে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। মাঝেমধ্যে সময় পেলে আমিও সিরিয়ালটি দেখেছি।

সাধারণত এজাতীয় সিরিয়ালে রসিকতার মান খুব উঁচুদরের হয় না, হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু উল্টা-পুল্টা একেক সময় আমার বেশ ভাল লেগেছে। রসিকতাগুলি অত্যুত্তম না হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট উপাদেয় এবং সজীব।

একটা নমুনা দিচ্ছি।

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রতিদিন সকালে ব্যবসা ক্ষেত্রে এসে ঘর খোলার পর কোনোরকম কাজকর্ম আরম্ভ করার আগে ঘরের দেয়ালে টাঙানো একটি বড় ফটোর গলায় টাটকা ফুলের মালা দেন। তারপর ধুপধুনো জ্বালিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে, চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সেই ফটোগ্রাফস্থ ব্যক্তিটির বন্দনা করেন।

কিন্তু এই পরম আরাধ্য ব্যক্তিটি কে?

ব্যবসায়ীর গুরুদেব?

না। তা নয়।

ব্যবসায়ীর পিতা? পিতামহ? শ্বশুরমশায়?

না। তাও নয়।

লক্ষ্মী? গণেশ? কোনও দেবতা?

না। এমনকি রামকৃষ্ণ-সারদা নন। মহাত্মা গান্ধী কিংবা সুভাষ বসুর মতো শ্রদ্ধেয় দেশনেতাও নন।

ফটোগ্রাফটি স্যুট-টাই পরিধান করা এক মধ্যবয়সী মানুষের। মাথায় অল্প টাক, ঠোঁটে একটু হাসি। একটু খোঁজ করার পরে জানা যায় ইনি আর কেউ নন, ইনি এই অঞ্চলের ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেক্টর। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক নিত্য তাঁর আরাধনা করেন। আগে নিয়ম ছিল সবার আগে গণেশ পুজো, এখন সেই গণেশের স্থান দখল করেছেন ওই আয়কর আধিকারিক।

কেউ হয়তো বলবেন, এটা কোনও উলটো-পালটা ব্যাপার নয়, বরং এটাই সঠিক ব্যাপার।

তা হলে এবার আমাকে প্রকৃত উলটো পালটার সন্ধান করতে হয়।

প্রথমে একটা মারাত্মক উলটো পালটা গল্প বলি।

ফায়ার ব্রিগেড অফিসে এক তরুণী মধ্যরাতে ফোন করেছে, 'দেখুন, আমাদের বাড়ির পিছন দিকের দেয়াল বেয়ে একটি ছেলে আমার ঘরের জানলা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে, অনেকক্ষণ প্রায় একঘণ্টা ধরে চেষ্টা করছে।'

টেলিফোনে জবাব এল, 'দেখুন এটা দমকলের অফিস। এ ব্যাপারে আমরা কি করব আপনি পুলিশে ফোন করুন।'

সেই তরুণী এবার বললেন, 'পুলিশ লাগবে না। আপনাদের দড়ির মই আছে না, দেয়াল বেয়ে ওঠবার জন্যে, সেই একটা ছেলেটাকে দিন না।'

এবার একটি অন্যরকম নমুনা দিচ্ছি।

সেদিন গঙ্গারামের ছেলে তার মা-বাবার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সে এখন একটু বড়সড় হয়েছে এবং ক্রমশ গঙ্গারামের মতো হচ্ছে। চেহারায় সাদৃশ্য তো থাকবেই, তার কথাবার্তাও বাপের মতোই গোলমেলে।

কথায় কথায় সে আমাকে বলল, 'জেঠু, সবাই যে বলে টেলিভিশনের ফলে মারপিট, গোলমাল এসব বেড়ে গেছে, এ কথাটা কিন্তু সত্যি।'

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, 'হঠাৎ একথা বলছ কেন?' সে বলল, 'দেখ জেঠু, বাড়িতে টেলিভিশন খুললেই বাবা রাগারাগি করে আমাকে মারধর করে। টিভির জন্যেই তো এসব হচ্ছে।'

পুনশ্চ :

(এক) উলটো পালটার অসামান্য উদাহরণ একটি মার্কিন রচনায় পেয়েছিলাম। বইটি গঙ্গারাম এনে দিয়েছিল, পড়ে দেখি বিবাহ বিষয়ে সেখানে উপদেশ আছে প্রেমে অসফল হলে, আত্মহত্যা না করে, বেঁচে থাকার সহজ উপায় যে কোনভাবে অন্য একটা বিয়ে করে ফেলা।

এই উপদেশটি ছিল উক্ত রচনার প্রথম পর্বে। শেষ পর্বে লেখা ছিল বিয়ের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা।

(দুই) রাত দুটোর সময় এক মত্ত ব্যক্তিকে পুলিশ রাস্তায় ধরেছে, 'কাঁহা যাতা হ্যায়?'

মাতাল বলল, 'বক্তৃতা শুনতে।'

পুলিশ অবাক। 'বক্তৃতা? এই মধ্যরাতে?'

মাতাল বলল, 'হ্যাঁ বাড়ি ফিরছি বউয়ের বক্তৃতা শুনতে। ঘণ্টাখানেক বলবে। শুনবেন তো আমার সঙ্গে আপনিও চলুন।'

পুজোর মজা

সেই একটা কথা আছে না, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। অবশেষে আমাদের সেই দশা হল।

চমৎকার ছিলাম ছেলের বাড়িতে ভূস্বর্গ ক্যালিফোর্ণিয়ায়। কলকাতায় পুজোর আগে তড়িঘড়ি ফিরে এলাম পুজোর মজা করতে।

এখন দেখছি ডাহা ভুল করেছি। ঠিক এই সময়ে ফিরে আসা ভুল হয়েছে।

কলকাতায় এসে একেবারে যাকে বলে গলা জলে পড়েছি। আক্ষরিক অর্থে গলাজল না হলেও হাঁটুজল তো বটেই।

বিমানবন্দর থেকে বাসায় ফিরে হাঁটুজলে নামলাম। শুনলাম দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়েছে। শুধু বৃষ্টি নয়, সঙ্গে ছিল ভয়াবহ বজ্রপাত।

বজ্রপাতের মজায় পরে আসছি। তার আগে জলের ব্যাপারটা সেরে নিই। জল, চারদিকে শুধু থই থই জল। সেই থইথই জলের মধ্যে এসে পৌঁছেছি মধ্যরাত পেরিয়ে, প্রায় পরের দিন ছুঁয়ে।

জল ভেঙে বাড়িতে ঢুকে ঘড়িতে দেখলাম রাত সাড়ে বারোটা বাজে। তার মানে, হিসেব করে দেখলাম। ছেলে ওখানে, মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্ণিয়ায় এখন দুপুর বারোটা।

ভাবলাম ছেলের অফিসে ফোন করে পৌঁছ সংবাদ জানিয়ে দিই। তাছাড়া একসঙ্গে শতাধিক দিন থেকে এলাম মনটা কেমন করছে। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টার বিমান যাত্রা তার মধ্যে হংকং এবং সিঙ্গাপুরে দু'দফা স্টপ ওভার। ছেলেও একটু চিন্তায় আছে।

ফোনের দিকে এগোতে, ছোট ভাই বিজন বলল, 'ফোন হবে না। আজ তিনদিন বন্ধ।'

আমি আর মিনতি সমস্বরে বললাম, 'সে কি!'

বিজন বলল, 'বৃষ্টির জল কেব্‌লের মধ্যে ঢুকে পুরো পাড়ার ফোন অচল হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'ও!'

কিন্তু মিনতি বলল, 'এতদিন যে শুনেছি সল্টলেকে কেব্‌ল মাটির নিচে নয়। ওপরে বাক্সের মধ্যে।'

পরদিন বিজন টেলিফোনের অফিসে গিয়ে একথা বলতে কেউ কিছু বলল না, তবে বিজন শুনে এল, জল ঢোকেনি, টেলিফোন কেব্‌লের ওপরে বজ্রপাত হয়েছে। তাছাড়া ধর্মঘট ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। সুতরাং অচিরে টেলিফোন চালু হবার সম্ভাবনা নেই।

কথাটা আমার বিশ্বাস হল না। আমি চিরদিনই আশাবাদী মানুষ এবং আমার খেয়াল আছে যে খোদ কেন্দ্রীয় টেলিফোন মন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা আমরা, খাস তালুকের প্রজা। সুতরাং ফোন চালু হতে দেরি হবে না।

কিন্তু আজ প্রায় এক সপ্তাহ পরেও কিছুই হয়নি। কিছু হবে, কবে হবে, সেটাও অনুমান করা যাচ্ছে না।

কেন যাচ্ছে না, সেটা অবশ্য অনুধাবন করতে পেরেছি।

টেলিফোনের পৃথিবীতে এখন স্পষ্টতই দু'জাতের মানুষ। এক জাতি হল আমরা যাদের সাধারণ টেলিফোন। অন্য জাত হল ক্ষমতাবান। ধনিক-বণিক, মন্ত্রী-নেতা, দারোগা-মাস্তান, যাদের রয়েছে মোবাইল বা সেলুলার ফোন। বজ্রপাতে বৃষ্টিপাতে, জলে, বন্যায় সে ফোন চালু থাকে। গীতায় যেমন বলেছে সূচও একে ছিদ্র করতে পারে না। আগুনও একে পোড়াতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ ফোন যার নেই, সে মানুষই নয়। তার অসুবিধা অভিযোগকে কে পাত্তা দেয়।

টেলিফোনের মজাটা একটু বেশি উপভোগ করেছি তাই একটু বেশি বলা হয়ে গেল। এবার অন্য মজায় যাই।

বাসায় আমার জন্যে পরপর কয়েকদিনের খবরের কাগজ সাজানো ছিল। সেগুলো একটু ওলটাতেই আবার মজা।

কলকাতার রাস্তায় গঙ্গার জল। সেই পুরনো কালীঘাট, যেখানে আমি বড় হয়েছি তারই গলিতে গলিতে জল। চমৎকার ছবি ছাপা হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়। নিজের শোবার ঘরে হাঁটুজলে বসে মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরকারি নথি দেখছেন। আরেক ছবিতে দেখলাম, যে দালানে আমি পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করেছি সেই রাইটার্স বিলডিংয়েব সামনে থইথই জল। এ দৃশ্য আমার চাকরি জীবনে দেখার সৌভাগ্য

হয়নি। অবশ্য বছরে দুয়েকবার বৃষ্টির জল জমত, ও তো শুনছি একেবারে খাঁটি গঙ্গাজল।

এ যাত্রায় ভেনিস যাওয়া হয়নি। এ সব দৃশ্য দেখে সে দুঃখ দূর হল। বেশ আনন্দ হল।

সবচেয়ে মজা পেলাম, বন্যা নিয়ে বাদানুবাদ, উক্তি-কটূক্তি দেখে।

প্রায় দেড় কোটি মানুষ জলে ভাসছে। ঘর নেই, বাড়ি নেই, অন্নহীন, বস্ত্রহীন। আগে দেখেছি দুর্গতেরা এরকম অবস্থায় হাইওয়ে কিংবা রেলওয়ে ট্র্যাকে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু এবার দেখছি, রেল ট্র্যাক সে সবও জলমগ্ন।

এই অবস্থায় লড়াই লেগেছে। এই বন্যা ভগবানের রচনা না মানুষের রচনা, এই নিয়ে চমৎকার চাপান-উতোর চলছে। যে পর্যায়ে বাদানুবাদ পৌঁছেছে, যে ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, বাল্যকালে বিদ্যালয়ের নিচু ক্লাশে সে রকম কিছু করলে পণ্ডিত মশায় আমাদের কানে ধরে বেঞ্চির ওপরে দাঁড় করিয়ে দিতেন।

তারপর বাজারে গিয়ে যা দেখছি, সে মজাও কম নয়। লঙ্কা ষাট, বেগুন তিরিশ। ইলিশ মাছ এবার ভাল খাওয়া হয়নি। দাম করে দেখলাম, সোয়া দুশো কেজি। মনে পড়ল একদিন নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটে বাংলাদেশি দোকানে আড়াই ডলার পাউণ্ড দরে পদ্মার ইলিশ কিনেছিলাম। এখানেও ওই একই দাম দাঁড়াল।

আর মজার কথা বলে তিক্ততা প্রকাশ করে লাভ নেই।

কিন্তু গোপনে, নিচুগলায় একটা কথা স্বীকার করতে চাই।

সব মজা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। কখনওই যাবে না।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে স্পষ্ট টের পেলাম গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে শিশির ঝরছে। শেফালির গন্ধ থমথম করছে হাওয়ায়। কোথা থেকে একটা ইষ্টিকুটুম পাখি এসেছে। থেকে থেকে ডাকছে, 'ইষ্টিকুটুম, ইষ্টিকুটুম'। দূরদর্শনে অজয় চক্রবর্তীর দেবীবন্দনা শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখি রাস্তা থেকে জল নেমে গেছে। আকাশে সাদা মেঘ ও বকের পালা। সেই কবেকার ছেলে বয়েসের মতো।
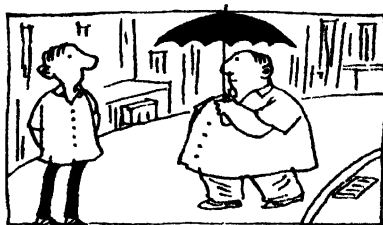
ছুটি

কতকাল আগে যেন লিখেছিলাম,

'জানেন ছোটবাবু,
আমার ছুটি নাই।'

এখন আর সে কথা বলা যাবে না। এখন আমার অফুরন্ত অবসর, আর সেই অবসরের ফাঁকে ফাঁকে এইসব জাতীয় হিজিবিজি রচনা।

এই সামান্য কাজটুকুর থেকেও আপাতত কয়েক সপ্তাহ ছুটি চাইছি। কিছুদিন প্রবাসে থাকব, সেই সময় লেখা হবে না, তবে কথা দিচ্ছি, পরে পুষিয়ে দেব।

যাওয়ার আগে, এই মুহূর্তে কয়েকটি গঙ্গারামীয় গল্প হাতে আছে, কয়েকটা পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

এক নেমতন্নে গিয়ে গঙ্গারাম খুবই জব্দ হয়েছে। গঙ্গারামের সঙ্গে অনেকদিন কোনো যোগাযোগ নেই, এমন এক পুরনো বন্ধুর বিলম্বিত বিবাহ। নববধূকে আগে কখনো সে দেখেনি তবে বন্ধু ভরদ্বাজের কাছে তার কথা আগে অনেক শুনেছে। এই মেয়েটির একটি বড় গুণ চমৎকার প্রেমপত্র লিখতে পারে। সে সব চিঠি এক সময়ে ভরদ্বাজ গঙ্গারামকে পড়িয়েছে।

আজ বিবাহবাসরে গঙ্গারাম নববধূর হাতে উপহার তুলে দিয়ে বলল, 'মালতীদেবী, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। কিন্তু আপনার কথা আমি ভরদ্বাজেব কাছে আগে অনেক শুনেছি। এমনকি আপনার লেখা দুয়েকটা চিঠিও ভরদ্বাজ আমাকে দেখিয়েছে।'

গঙ্গারামের কথা শুনে নববধূর দুই চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছিল। একটু থমকিয়ে গিয়ে গঙ্গারাম বলল, 'এসব কথা বললাম বলে, রাগ করলেন নাকি মালতীদেবী।'

নববধূ বললেন, 'দেখুন আমি মালতীদেবী নই। বিয়ের আগে আপনার গুণধর বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় কিছুই হয়নি। কোনোদিন কোনো চিঠি লিখিনি। আপনাদের মালতীদেবীর মতো নষ্টমেয়ে নই আমি।'

নিজের ভুলটা অবশ্য গঙ্গারাম ধরতে পারল কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে।

গঙ্গারামের যা ব্যাপার, তাকে এরকম বেকায়দায় মাঝে মধ্যেই পড়তে হয়।

কিন্তু বিপদ হয়েছে আমার, আমার প্রশ্রয় পেয়ে সে বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। আজকাল আমার সঙ্গেও ইয়ার্কি করছে।

সেদিন সকালবেলা বাসায় এসেছে। আমি বেরোচ্ছি, আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'আমেরিকা যাচ্ছি।'

গঙ্গারাম বলল, 'সে তো যখন যাবেন, যাবেন, এখন ছাতা হাতে কোথায় যাচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'আমেরিকা যাওয়ার ভিসার জন্য ফটো তুলতে যাচ্ছি।'

এবার মোক্ষম কথা বলল, 'বাপরে আয়তনে এখন আপনার যেরকম স্বাস্থ্য, সিঙ্গল পাসপোর্ট ফটো নয়, ফটোগ্রাফার আপনার কাছ থেকে গ্রুপ ফটোর চার্জ নেবে।'

পুনশ্চ :

গঙ্গারাম আমাকে আবার জব্দ করেছে। আর কাউকে না পারুক, আমাকে জব্দ করার ব্যাপারে সে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে।

ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। রবিবারের সকালবেলা। প্রবল মাথাধরা নিয়ে বসে আছি।

এমন সময় গঙ্গারাম এল। তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'গঙ্গারাম, মাথা ধরার জন্যে কি করা যায়?'

গঙ্গারাম বলল, 'কি আর করবেন। আগের দিন রাতে প্রচুর মদ্যপান, সিগারেট সেবন সহ হৈ হুল্লোড় করবেন, দেখবেন সকালবেলা কি চমৎকার মাথা ধরেছে।'

প্রবাসে রঙ্গরসে

চারমাস পরে দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু এসে দেখি গঙ্গারাম নেই। নেই তো নেইই। অনেক খোঁজ করলাম, পরিচিতদের জনে জনে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদেরও করছি, 'আপনারা কেউ এর মধ্যে গঙ্গারামকে দেখেছেন?'

উত্তর তো একই হবে, 'না'। সুতরাং গঙ্গারামের অপেক্ষায় বসে থেকে লাভ নেই, সে যখন ভাল বোঝে ফিরবে, আপাতত গঙ্গারামকে ছাড়াই আবার লেখা আরম্ভ করি।

গঙ্গারামকে পরিত্যাগ করা অবশ্য সহজ নয়। সেই সুদূর মার্কিন নিউইয়র্কে সীমান্তবর্তী আটলান্টিক (আটলান্টা নয়, সে অন্য শহর) শহরে বিংশ বঙ্গ সম্মেলনে গেছি, সেখানেও গঙ্গারাম আমার কাঁধে ভূতের মতো বসে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সচিব শ্রীযুক্ত অরুণ ভট্টাচার্য, আমাকে এতকাল চেনেন, কিন্তু বিদেশে কেমন গুলিয়ে ফেললেন, আমাকে বললেন, 'এই যে গঙ্গারামবাবু! আপনিও এসে গেছেন।' বলা বাহুল্য তাঁর ভ্রম নিরসনের চেষ্টা করিনি।

প্রবাসে বসে ছিলাম না। পাঠক পাঠিকাদের জন্যে তাজা খবরের যথেষ্ট খোঁজ করেছি। তেমন নতুন বইপত্র কিছু দেখলাম না। খবর পেলাম এখন রঙ্গরসিকতা সবই টঙে উঠেছে। মানে ইন্টারনেটে, ই মেলে। সে সব আমার নাগালের বাইরে।

তবু কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, কাস্টমস-ইমিগ্রেশনের নজর এড়িয়ে দুচারটে টাটকা রসিকতা আনতে পেরেছি। কতখানি টাটকা তা বলতে পারব না, তবে আমার কাছে নতুনই মনে হচ্ছে।

মাজার কথা এই যে, অধিকাংশ গল্প দাম্পত্য বিষয়ক। যৌন রসিকতাও অনেক, তবে তার সবই আমাদের মাপকাঠিতে অত্যন্ত অশ্লীল। ওই যাকে বলে মুদ্রণযোগ্য নয়।

সে যা হোক, দুয়েকটি নিরামিষ দাম্পত্য কাহিনী, যে রকম শুনে এলাম তাই

বলি।

সানফ্রানসিসকো শহরের দোকান পাড়ায় জনবহুল ফুটপাথে এক ভদ্রলোক বেশ কয়েক ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কোমর ব্যথা করছে, হাঁটু টনটন করছে, পায়ের পাতার নিচে জ্বালা করছে। অবশেষে আর দাঁড়াতে না পেরে ভদ্রলোক সামনের পুলিশ সার্জেন্টকে অনুরোধ করলেন, 'অফিসার আপনি আমাকে অর্ডার করুন এখান থেকে চলে যেতে।'

অফিসার তো আবাক, 'সে কি? কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন, সেই চারটের সময় আমার স্ত্রী আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সামনের ওই মহিলা-পোশাকের দোকানে গেছেন, বলে গেছেন, না আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে। এখন সাড়ে সাতটা বাজে, সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। পা ধরে গেছে, মাথা ঘুরছে। কিন্তু আমার সাহস নেই বৌয়ের কথা অমান্য করি। এখন শুধু আপনি অর্ডার করলে আমি এখান থেকে যেতে পারি। বৌকে বলতে পারব পুলিশের হুকুমে সরে যেতে বাধ্য হয়েছি।'

এর পরের কাহিনীটি খুব সরল, চেনা-চেনা।

এ সেই পুরনো পানশালার গল্প।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সহপায়ীদের কাছে কবুল করছিলেন, 'দ্যাখো তোমাদের একটা গোপন কথা বলি।'

সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বিষয়ে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার দাম্পত্য জীবন বিষয়ে।'

সবাই চমকপ্রদ, মুখরোচক কাহিনী শোনার জন্য তখন উন্মুখ।

ভদ্রলোক বললেন, 'প্রথম পঁচিশ বছর আমি আর আমার স্ত্রী খুব সুখে আনন্দে ছিলাম।' সবাই প্রশ্ন করল, 'তারপরে?' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রৌঢ় বললেন, 'তারপরে আমাদের দুজনার দেখা হল, ভাল বাসা হল, বিয়ে হল। তারপর থেকে দুঃখের শুরু।'

লেখা শেষ করছি এমন সময় গঙ্গারাম দৌড়তে দৌড়তে হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে উপস্থিত। এসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমেরিকায় এই গল্পটা কি পৌঁছেছে?'

আমি বললাম, 'আগে গল্পটা বলো।'

গঙ্গারাম বলল, 'এক ট্র্যাফিক কনস্টেবল হঠাৎ দেখে যে দূর থেকে একটা গাড়ি আসছে, কয়েক সেকেণ্ড পর পর গাড়িটা কেমন লাফাচ্ছে। লাল আলোতে গাড়িটা থেমে যেতে কৌতূহলী কনস্টেবল গাড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে গাড়ির চালককে প্রশ্ন করল, 'গাড়িটা এমন করছে কেন? গাড়িটার কি হয়েছে বলুন তো?' একটা

হেঁচকি তুলে চালক বললেন যে, 'গাড়ির কিছু হয়নি, কড়া জর্দা দিয়ে পান খেয়ে আমারই ঘনঘন হেঁচকি উঠছে। তারই তালে তালে গাড়িটা লাফাচ্ছে।'

গল্পটা মন দিয়ে শুনে আমি বললাম, 'না। এ গল্পটা এখনো আমেরিকা পৌঁছায়নি।'
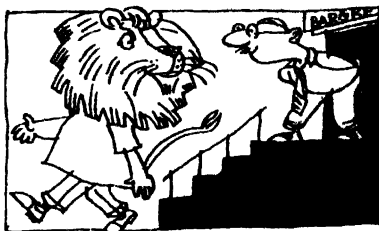
জানোয়ার

মহামান্য শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে একই গাড়িতে একবার হাবড়া-বাণীপুরে একটি সাহিত্যসভায় যাচ্ছিলাম। পথে যেতে যেতে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ রসিক চূড়ামণি আমাকে বলেছিলেন, 'দ্যাখো, আমার ভাগ্নেগুলো সব জানোয়ার।'

সমবেদনা জানিয়ে আমি বলেছিলাম, 'মানুষ হয়নি একজনাও?'

শিবরাম বললেন, 'মানুষ হবে না কেন? হিরের টুকরো ছেলে একেকটি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তা হলে?'

শিবরাম বললেন, 'বন থেকে এসেছে কি না, তাই ওরা জানোয়ার।'

সেদিন শিবারামীয় ধাঁধা অনুধাবন করতে আমার বেশ পরিশ্রম হয়েছিল। আমার বাঙ্গাল জিহ্বায় 'বন' উচ্চারণ সর্বদাই 'বন', কিন্তু শিবরামের উত্তরবঙ্গীয় টানে বনের উচ্চারণ বোনের মতো। ভাগ্নেরা বোন (বন) থেকে এসেছে তাই তারা জানোয়ার।

এরকম বিশ্লেষণ শুধু শিবরাম, শিবরাম চক্রবর্তীর পক্ষেই সম্ভব।

বনের মানুষ নয়, আমি এবার প্রকৃত জানোয়ার অর্থাৎ বনের পশুর কথা বলি। আর বলতেই যদি হয়, তবে পশুরাজের কথাই হোক।

পশুরাজ মানে সিংহ। সেই বাল্যকালে, বলা উচিত, প্রায় শিশুকালে সিংহের কথা পড়েছিলাম,

'সিংহমশায় সিংহমশায় মাংস যদি চাও
রাজহংস দেবো খেতে হিংসা ভুলে যাও।'

আমরা এখন সেই সিংহের গল্পে যাচ্ছি।

মহারাজা সিংহকে আমরা একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাচ্ছি। মহারাজা একা যাননি। তার সঙ্গী একটি রামছাগল।

বেয়ারা আসতে রামছাগল বললো. 'আপনাদের রান্নাঘরে দেখুন তো আলুর খোসা, কপির পাতা এইসব পড়ে আছে কিনা, তা হলে আমাকে তাই এক প্লেট দিন।'

বেয়ারা কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হলো। এই সব ফেলনা জিনিসের কোনও কেনাবেচা সে কখনো দেখেনি, তবু বুদ্ধি করে সে বললো, 'এ তো আপনার জন্যে হল, আপনার বন্ধু সিংহমশায় কিছু খাবেন না?'

এই বেয়ারা সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ছিল না। ছোটবেলায় সেও যোগীন্দ্রনাথ সরকার পড়েছিল, তার মনে আছে সিংহমশায়'—'রাজহংস খেতে দেবো। হিংসা ভুলে যাও।'

বেয়ারা প্রস্তাব করল, 'আমাদের এখানে খুব ভালো রাজহাঁসের ডাক-রোস্ট (Duck-Rost) পাওয়া যায়। গোটা কয়েক নিয়ে আসি। সিংহমশায়ের নিশ্চয় খুব খিদে লেগেছে।'

রামছাগল হেসে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? সিংহমশায়ের খিদে লাগলে আমি কি এখানে বসে থাকতাম? তার আগেই ছুট দিতে হবে।'

রেস্তোরাঁ এবং সিংহের এর পরের গল্পটা অনেকেরই চেনা মনে হবে।

এ গল্পে সিংহমশায় একাই একটি রেস্তোরাঁয় গেছেন। রেস্তোরাঁ কাম বার।

এক সন্ধ্যায় সিংহমশায় সেখানে প্রবেশ করলেন। খদ্দের, কর্মচারী সবাই ভয়ে অস্থির। কিন্তু সিংহমশায় কাউকে কিছু না বলে একটা খালি টেবিলে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। তার পর হুইস্কি এবং মাংসের কাটলেট অর্ডার করলেন।

এ ঘটনা নাকি নাইরোবির। আশ্চর্যের কথা, সেদিন সেই পানশালায় গঙ্গারামের মামাশ্বশুরও উপস্থিত ছিলেন। তাই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ আমরা জানতে পারছি। তিনি পানশালায় সিংহমশায়ের পাশের টেবিলেই ছিলেন। তা, সিংহমশায় ধীরেসুস্থে কয়েক পেগ হুইস্কি, গোটা চারেক কাটলেট খেলেন। তার পর বেয়ারাকে ডেকে হিসেব করে বিল মিটিয়ে দিলেন, শুধু একবার মুখে বললেন, 'হুইস্কির দেখছি গলাকাটা দাম।'

এতক্ষণে গঙ্গারামের মামাশ্বশুর কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করেছেন। তিনি সিংহের টেবিলে গিয়ে বললেন, 'দেখুন সিংহমশায়, আজ বহু বছর আমি এই বারে আসছি কিন্তু কস্মিন কালেও কোনও সিংহকে হুইস্কি খেতে আসতে দেখিনি।'

রাজকীয় পদক্ষেপে পানশালা থেকে বেরোতে বেরোতে সিংহমশায় বললেন, 'আর কোনওদিন দেখবেও না। হুইস্কির যা দাম দেখছি, আর কোনও সিংহের সাধ্য

হবে না হুইস্কি খাওয়ার।'
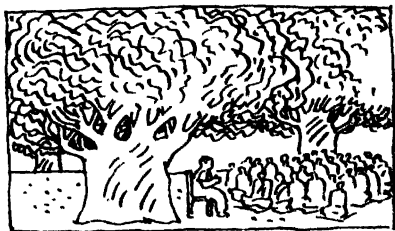
সাধু-সাধু

'মানব আমার মামাতো ভাই,
তার একটা লাল জামা চাই।'

এ-রকম সাবলীল এবং অনাবিল পদ্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আকস্মিকভাবেই।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠভবন বিদ্যালয়ে চৌদ্দ দিনের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। কাজ ছিল কিশোর-কিশোরীদের ক্লাস নেওয়া, গল্প-কবিতার ক্লাস।

আমাদের প্রথম যৌবনের, মানে প্রায় অর্ধ শতক আগের একটি আশ্চর্য রোমান্টিক কবিতার কয়েকটি পংক্তি এখনও আমার মনে গুনগুন করে।

সেই কবিতার নাম, 'শান্তিনিকেতনে ছুটি।' আমার প্রিয় পংক্তিগুলি মনে পড়ছে, ...'শান্তিনিকেতনের বৃষ্টি: ছুটি শেষ।

ভিজে আলতালাল শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউন্টার চুপ। কাল হয়েতো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই,

ভিজে ঘাস।

লোহার গরাদ ঘেরা আম্রকুঞ্জে

কবিতার ক্লাস কাল থেকে ঢের।' ...

এ কবিতা পঞ্চাশ বছর আগেকার। সেই লোহার গরাদ ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাসে পৌঁছাতে আমার পঞ্চাশ বছর, অর্ধেক শতক লাগল।

লোহার গরাদ দেখলাম না, সীমানা ঘিরে তারের জাল অবশ্য আছে। এবং সত্যিই গাছের নিচে ক্লাস। যায়-যায়, যায় না শীত শেষের সকাল বেলার নরম রোদে, ঝিরিঝিরি আলোছায়ায় কবিতার ক্লাস। ছাত্র-ছাত্রীরা মোরামের উঠোনে আসন পেতে বসেছে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা বাঁধানো বেদির ওপরে কিংবা তিনিও নিচে বসেছেন।

আমি অবশ্য শারীরিক আয়তনের কারণে চেয়ারে বসেছি, ক্লাসের মনিটর বা অন্য কেউ গিয়ে একটা প্লাস্টিকের চেয়ার কোনও ঘর থেকে নিয়ে আসত।

অনেক ক্লাসই গাছের নিচে খোলা উঠোনে হত, তবে ঘরেও ক্লাস হয়েছে। ঠিক কোন ক্লাস কোথায় হয় সেটা ধারনা করতে পারিনি।

ষাট বছর আগে আমার শৈশব পূর্ববঙ্গে আমাদের ছোট শহরে আমি যে পাঠশালায় পড়েছি সেখানেও মাদুর নিয়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়তে হত। সে ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত দুধের শিশুদের জন্যে, তাকে বলা হত মাটির ক্লাস। কয়েক বছর পরে একটু বড় হয়ে কাঠের বেঞ্চিতে ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছিলাম।

এখানে অবশ্য একটু বড় ছেলেমেয়েদের (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) তাদের ক্লাস আমি নিয়েছি। ক্লাস মানে লেখাপড়া কিছু নয়, হালকা গল্প-কবিতা, আলাপ-পরিচয়।

সব গল্প-কবিতা যে আমাকেই বলতে হয়েছে তা নয়, ছেলেমেয়েরাও প্রথমে একটু সঙ্কোচ করলেও পরে নিজেদের গল্প কবিতা আমাকে শুনিয়েছে। সেই রকম একটির নমুনা দিয়ে এই রচনা শুরু করছি।

একটি কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কবিতা লেখ?'

সে একটু লজ্জিত ভাবে বলল, 'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'কবিতা লেখার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই, তা তুমি কি বিষয়ে কবিতা লেখ?'

অন্যেরা বলেছে, নদী-ঝর্ণা, পাখি-ফুল, রোদ-জোৎস্না নিয়ে তারা কবিতা লেখে, এ মেয়েটি বলল, সে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে কবিতা লেখে। যথা, ঠাকুমা, মেজকাকা, মামাতো ভাই, পিসতুতো বোন। এরই ফলশ্রুতি হল,

'পিয়াল আমার পিসতুতো বোন,
নাকি কান্না যখন তখন।'

এবং ঐ প্রথমোক্ত,

'মানব আমার মামাতো ভাই,
তার একটা লাল জামা চাই।'

ঝিরঝিরে বাতাস অল্প অল্প করে দক্ষিণমুখী হচ্ছে। হালকা রোদে মাঠের একপাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ঘন্টা বাজতেই অন্য ক্লাস থেকে ছেলেমেয়েরা একে একে কবিতার ক্লাসে চলে আসছে। নিয়মিত পড়াশুনোর ব্যাপার নয়, জ্যামিতি বা ব্যকরণ এমন কি ইতিহাস-ভূগোল নয়, একটা মুক্তির আনন্দ তাদের চোখেমুখে।

একজন একজন করে আসছে, আমাকে একে একে বলছে, 'তারাপদদা, নমস্কার,' 'তারাপদদা, নমস্কার।' যেন ছোট ছোট ঢেউ উঠছে দীঘির জলে।

ছেলেমেয়েরা নিজেরাই পছন্দ মতো একটা গাছের তলা বেছে নিল। আমার জন্যে চেয়ার নিয়ে এল। সবাই আসন পেতে বসে গেল।

এবার গল্পের পালা। আমি বলি, 'তোমরা যে কেউ একটা গল্প বল।' ওরা বলে,'আপনি একটা গল্প বলুন।' কখনও বা কবিতা। প্রতিটি গল্প-কবিতার শেষে সমস্বরে 'সাধু-সাধু।'

মধুরতম অভিজ্ঞতা হয়েছিল শিশু বিভাগের সাহিত্যসভায়। সভা বসেছিল সন্ধ্যা সোয়া ছ'টায়। খোলা মাঠে অল্প কয়েকটি আলো, একটি মাইক, আমার জন্যে একটি চেয়ার। আর অসংখ্য শিশু, বালক-বালিকা, পেছনের দিকে অভিভাবক বা অধ্যাপকেরাও অনেকে রয়েছেন বলে মনে হল।

উদ্বোধনী সঙ্গীত 'বসন্তে ফুল গাঁথল' দিয়ে সেই ফাল্গুন সায়াহ্নের অনুষ্ঠান আরম্ভ। শেষ আশ্রম সঙ্গীত দিয়ে। এর মধ্যে পাঠ তিরিশটি রচনা, কবিতা ছড়া। সেই সঙ্গে সমবেত সঙ্গীত, 'ওরে বকুল পারুল।' প্রথম গানটি গেয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা, পরেরটি গাইল তৃতীয় শ্রেণীর। সর্বশেষে চতুর্থ শ্রেণীর সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্য, 'ওরা অকারণে চঞ্চল।'

কিন্তু সেই সভায় একটি শিশুও কারণ বা অকারণে চঞ্চল ছিল না। কবিতা-রচনা সবই ছোট আকারের ছিল। কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সমাপ্ত হল। দু'জনের নাম মনে আছে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অনুষ্ঠান পরিচালনায় আমাকে সাহায্য করেছিল মোনালিসা পাল এবং বরুণ মুখোপাধ্যায়।

সেই সন্ধ্যাটা ছিল পূর্ণিমার কাছাকাছি একটা তিথির। প্রতিটি রচনা বা ছড়ার পরে রব উঠছে, 'সাধু-সাধু।' একটু পরে চাঁদ উঠল বাঁশবনের মাথায়, দূরে কোকিল ডাকছে। আমি অভিভূত। এমন সুন্দর সাহিত্য-সভায় এর আগে কখনও যাইনি।

বেশ কয়েকদিন হল শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসেছি। এখনও চোখে ভাসছে অমল শিশুদল আর কিশোর-কিশোরীর হাসিমুখ। এখনও কানে শুনছি, 'তারাপদদা নমস্কার', 'তারাপদদা নমস্কার'।

আমি মনে মনে বলি, 'সাধু-সাধু।'
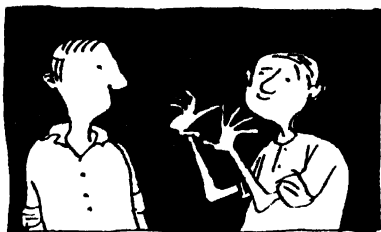
জানা-অজানা

সত্যিই কত কি জানি না আমরা। আপনি কি জানেন, আপনার প্রিয় চিনে খাবার 'চাওমিন' মানে কি?

চিনে ভাষায় চাওমিন মানে ময়দা।

আপনি কি জানেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য রচনায় প্রথম কমা, সেমিকোলন ব্যবহার করেন।

আপনি কি জানেন, এখন যেখানে কল্পতরু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আগে সেখানে জেলখানা ছিল।

আপনি জানেন না, জানার কথাও নয়। আমিও জানতাম না, যদি না গত সপ্তাহে একটি কবিতা উৎসবে যোগদানের জন্যে হাওড়া থেকে মেদিনীপুরগামী একটা লোকাল ট্রেনে উঠতাম।

এই ট্রেনযাত্রার সময়ই জানতে পারি, ইউরোপে সুইফটস নামে একরকমের পাখি আছে যারা কখনও আকাশ থেকে মাটিতে নামে না, সারা জীবন আকাশে ওড়ে, আকাশেই জন্মায়, আকাশেই ডিম পাড়ে। সেই ডিম আকাশ থেকে পড়তে পড়তে আকাশেই ফেটে যায়, আকাশেই উড়তে থাকে ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা সদ্যজাত বিহঙ্গশিশু। যার ভাবী জীবন কাটবে শূন্যে শূন্যে উড়ে উড়ে।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, তাই না? আমিও অবিশ্বাস করতাম, যদি না মুদ্রিত অক্ষরে এই তথ্য পাঠ করতাম। বাল্যকাল থেকে মুদ্রিত অক্ষরের সত্যতায় আমার অপরিসীম আস্থা।

হকারের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে নগদ পাঁচ টাকা ব্যয় করে আমি মেদিনীপুর লোকালে 'জানবার কথা' নামে একটা পুস্তিকা ক্রয় করেছি। বলা বাহুল্য, এই সব তথ্য ওই বই থেকেই আহরিত।

এই বই পাঠ করে আমি আরও জেনেছি যে, জেব্রার গায়ে সাদার ওপরে কালো ডোরা দাগ থাকে (ওপরে সাদা ডোরা নয়) এবং টার্জন শব্দের অর্থ

শেতাঙ্গ, সাদা মানুষ।

এ সব তথ্যের সত্যাসত্য নিরূপণ করা সব সময়ে সম্ভব নয়।

তা ছাড়া পারম্পর্যহীন এইরকম তথ্য, প্রায়শই অপ্রয়োজনীয়, একমাত্র জামাই ঠকানো প্রশ্ন করা ছাড়া আর কোনও কাজে লাগে না।

অবশ্য সব বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা ভাল। শুধু জ্ঞান থাকলেই হয় না। সজ্ঞানে উপযুক্ত ব্যবহার করা প্রয়োজন।

কোনও বিষয়ে যাঁরা জানেন এবং যাঁরা জানেন না, মানে সমস্তজনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—

১) যিনি জানেন যে তিনি জানেন। এঁরা সর্বোত্তম জ্ঞানী।

২) যিনি জানেন না যে তিনি জানেন। আমরা অনেকেই এই গোত্রের। কত জিনিস যে আমরা জেনেও জানি না।

৩) যিনি জানেন না যে তিনি জানেন না। আমাদের মধ্যে এই জাতীয় লোক অনেক, এঁরা সবজান্তা কিন্তু কিছুই জানেন না।

৪) যিনি জানেন যে তিনি জানেন না। এঁরা মিতবাক এবং নিরাপদ।

পুনশ্চ:

আজ কিছুদিন হল, আমার কাছ থেকে 'জানবার কথা' বইটি ধার করে পড়বার পর থেকে গঙ্গারামের মাথায় একটা খেয়াল চেপেছে। চেনা-অচেনা যে কোনও লোককে একটু বাগে পেলেই সে তাকে জ্ঞানের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সেটা, কবে সিরাজদৌল্লা পলাশীর যুদ্ধের আগের বছর কলকাতা দখল করে কলকাতার নামকরণ করেছিলেন 'আলিনগর'। গঙ্গারামের প্রিয় প্রশ্ন হল, কোন শহরের একবার নাম রাখা হয়েছিল 'আলিনগর'। এই প্রশ্ন সে আমাকেও করেছিল।

কিন্তু এসব প্রশ্ন তো কোনও স্থিতবুদ্ধি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পাত্তা দিতে চায় না। তাই গঙ্গারাম আজকাল প্রশ্নত্তোরের খেলায় বেটিং ঢুকিয়েছে। কেউ একটা প্রশ্ন করবে গঙ্গারাম উত্তর দিতে পারলে দশ টাকা পাবে, না পারলে দশ টাকা দেবে। তারপর সে আবার গঙ্গারামের প্রশ্নের উত্তর দেবে, উত্তর ঠিক হলে গঙ্গারাম দশ টাকা দেবে, না হলে সে গঙ্গারামকে দশ টাকা দেবে।

কিন্তু এই বেটিংয়ের খেলাতেও খেলোয়াড় পাওয়া কঠিন। সেদিন ক্লাবে এক বোকাবোকা নতুন সদস্যকে গঙ্গারাম খেলায় রাজি করায়। তবে তিনি কবুল করেন তিনি তো আর গঙ্গারামের মতো সবজান্তা নন, তাই তিনি হারলে দশ টাকাই দেবেন, তবে গঙ্গারাম হারলে কুড়ি টাকা দিতে হবে।

সেই বোকাবোকা ভদ্রলোক গঙ্গারামকে প্রশ্ন করলেন, 'সকালে গোলগাল,

দুপুরে চৌকো, সন্ধ্যায় তিন কোণাচে কোন্ জিনিস?' অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে গঙ্গারাম বললেন, 'বলতে পারছি না', এই বলে ভদ্রলোককে কুড়ি টাকা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন আপনি বলুন জিনিসটা কি?' এবার ভদ্রলোক কুড়িটাকার মধ্যে দশ টাকা পকেটস্থ করে বাকি দশ টাকা গঙ্গারামকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'এই নিন আমার দশ টাকা, আমিও উত্তরটা জানি না।'

কথা বলার বিপদ

গভীর রাতের রাস্তায় সন্দেহজনক ভাবে চলাফেরা করতে দেখে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। কিছুক্ষণ জেরা করার পর সে স্বীকার করে যে সে আসলে চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরছিল।

লোকটাকে ফৌজদারি আদালতে পেশ করা হয় এবং আদালতকে জানানো হয় যে লোকটি নিজেই কবুল করেছে যে সে নিজে একজন চোর।

আদালতকে এত সহজে সন্তুষ্ট হলে চলে না। তাই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোর্ট দারোগার কাছে জানতে চাইলেন, 'এই লোকটি সত্যি কি বলেছিল। সত্যিই কি সে বলেছিল যে. আমি চোর।'

পুলিশ আর কি বলবে, বলল যে, 'না স্যাব। যতদূব মনে পড়ছে ও বলেনি যে আপনি চোর।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, 'আপনি কোর্ট দারোগার কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য। একটা সোজা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না। এই আসামি কি সত্যি বলেছিল যে আমি চোর?'

কোর্ট দারোগা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'হুজুর আপনি চোর হতে পারেন কিন্তু আসামি একবারো বলেনি যে আপনি চোর!'

হাকিম এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'আমি জানতে চাই না আমি চোর কি না, আমি শুধু যেটা জানতে চাই, আসামি কি বলেছিল, আমি চোর।'

আদালতের রাগ দেখে আসামি পক্ষের উকিল কোর্ট দারোগাকে বললেন, 'হুজুর জানতে চাইছেন, আসামি কি নিজের মুখে বলেছিল, 'আমি চোর'।'

দারোগা বললেন, 'হ্যাঁ সে স্পষ্টই বলেছিল, আমি চোর।'

এবার হাকিম চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন, কোর্ট দারোগাকে বললেন, 'আপনি কি স্বীকার করেন যে আপনি চোর?'

এবার কোর্ট দারোগা অস্থির হয়ে বললেন, 'হুজুর, গোস্তাকি মাফ করবেন, আমি চোর নই, আপনি চোর নন, এমন কি ওই আসামিও চোর না। এই মামলা আমি আর চালাচ্ছি না, আসামিকে খালাস দিন।'

একদা শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন, 'শিব্রাম চক্রবর্তীর মত কথা বলার বিপদ।'

এক্ষেত্রে অবশ্য বিপদ হয়েছে অপরের উদ্ধৃতি নিজের বাক্যে ব্যবহার করতে গিয়ে।

কথা বলার মধ্যে অনেকের অনেক রকম মুদ্রাদোষ থাকে।

সেদিন হাঁটতে বেরিয়ে গলির মোড়ে দেখি আমার প্রতিবেশী নির্বিবাদী অভয়বাবুকে এক ব্যক্তি যাচ্ছেতাই সব কথা বলছে। অভয়বাবু, অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার, নির্বিকার মুখে তিনি সব কথা শুনছেন।

আমি শুনলাম, লোকটি অভয়বাবুকে বলছে, 'ছুঁচো কোথাকার, সারাজীবন তলে-তলে বদমায়েশি করে যাচ্ছ, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।' অভয়বাবুর সঙ্গে আমি সন্ধ্যাবেলা হাঁটতে যাই, কিন্তু আজ এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না, আমি এগিয়ে চলে যাচ্ছিলাম সহসা অভয়বাবু অভিযোগের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকলেন।

আমি দাঁড়ালাম। তারপর দুজনে হাঁটতে লাগলাম। কৌতূহল নিবৃত্ত করতে না পেরে একটু পরেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওই ভদ্রলোক আপনাকে কি বলছিলেন?'

অভয়বাবু হাসলেন, তারপর বললেন, 'আপনি বুঝতে পারেননি। উনি আমাকে গালাগাল করছিলেন না। উনি আমার ইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক, ওঁর এক সহকর্মী, তিনিও আমার বিশেষ পরিচিত। তাঁর সম্পর্কে ওইসব কথা বলছিলেন। ওই কথাগুলো তিনি তাঁকে বলেছেন, সেটাই আমাকে শোনাচ্ছিলেন।' বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পরে আমি কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হলাম।

কিন্তু সব সময় ধাতস্থ হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের যৌবনকালে একটা বিখ্যাত কমিক ছিল, সেটা পুজোর রেকর্ডেও বেজেছিল। সেটা বোধহয় ছিল সন্দীপ সান্যালের কৌতুকানুষ্ঠান।

কিছু লোকের অভ্যাস আছে না সব কথার মধ্যে, 'তোমার' বা 'আপনার' শব্দটা ঢুকিয়ে দেয়, এই কৌতুকটি ছিল তারই একটি অতি সরস বিবরণ।

রাস্তার মোড়ে দুই প্রতিবেশীর দেখা, একজন বাজারে যাচ্ছেন, অন্যজন ফিরছেন। যিনি বাজার করে ফিরছেন তিনি তাঁর স্ত্রীর কথামতো মাছের মাথা, মাংস ওই সব বাজারে কিনেছেন, অনাবশ্যক 'আপনার' যোগে তিনি প্রতিবেশীকে বললেন,

'এই (আপনার) বাজারে গিয়েছিলাম। (আপনার) স্ত্রী বললেন (আপনার) মাংস আনতে, বড় দেখে (আপনার) মাথাও আনতে বললেন। তা (আপনার) যা চড়া দাম...'

শ্রোতা প্রতিবেশী এ ধরনের বাক্যালাপের সঙ্গে পরিচিত। তাই কোনও গোলমাল হয়নি।

রিডার্স ডাইজেস্ট

বিদ্বজ্জন নাক কুঁচকোবেন, হাতের সামনে পড়ে থাকলেও পণ্ডিতেরা ছুঁয়ে দেখবেন না।

রিডার্স ডাইজেস্ট নিতান্ত সাধারণ, আটপৌরে পাঠকের জন্যে নলেজ মেড-ইজি। ইতিহাস-ভূগোল, বিজ্ঞান-স্বাস্থ্য, চাঞ্চল্যকর সত্য ঘটনা, সমসাময়িক বিষয় কি নেই এই মাসিক পত্রিকায়। এই পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ধর্ম, মানবিক সম্পর্ক, পারিবারিক জীবন এমনকি দাম্পত্য সমস্যা।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে রচনা বাছাই করে, কখনো কিছুটা সম্পাদনা করে, কিছুটা রচনা সহ রিডার্স ডাইজেস্টের প্রতিটি সংখ্যাই সুমুদ্রিত এবং সুসম্পাদিত। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দশটা বই বা পত্রিকা না পড়েই এই কাগজ থেকে মোটামুটি জানা যায়।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা, স্কলার ও গবেষক এ রচনা পত্রিকা পছন্দ করবেন না, এটা বলা বাহুল্য মাত্র। রিডার্স ডাইজেস্ট পাঠ করে অনেক বিষয়ে ভাষা ভাষা কিছু জানা যায় কিন্তু জ্ঞানের অন্বেষণ সম্ভব নয়। ওই যাকে পল্লবগ্রাহিতা বলে তাই আর কি।

সে যাই হোক, কবুল করতে দ্বিধা নেই, আমি বহুকাল ধরে এই পত্রিকার অনুগত

পাঠক। শুধু তাই নয়, এই পত্রিকা পাঠ করে আমি রীতিমত লাভবান হয়েছি, প্রকৃত আর্থিক অর্থে লাভবান।

আমি অদ্যাবধি হালকা রচনা, ব্যক্তিগত নিবন্ধ, রম্য প্রবন্ধ ইত্যাদি হাস্যকর যা কিছু লিখেছি তার একটা বেশ বড় অংশ টুকে লেখা। টোকা মানে বিলিতি জোকবুক থেকে। হাসির বই থেকে এবং সর্বোপরি রিডার্স ডাইজেস্ট থেকে।

এই পত্রিকায় গল্প-উপন্যাস ছাপা হয় না কিন্তু প্রতিটি প্রবন্ধের নিচে পাদপূরণ হিসেবে খণ্ডকাহিনী, অনুগল্প, কৌতুকী ইত্যাদি মুদ্রিত হয়। তাছাড়া 'হাসিই শ্রেষ্ঠ ঔষধ' (Laughter is the best medicine), জীবন ওই রকম (Life is like that) ইত্যাদি জনপ্রিয় কলাম রয়েছে। এসবের মধ্যে আমার লেখার উপজীব্য যথেষ্ট। তবে সোজাসুজি লিখি না। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার নিজের কায়দায় লিখি।

অনেক সময় খুব বেশি বদলাতে হয় না। যেমন সাম্প্রতিক একটি সংখ্যায় (জুলাই, ১৯১৯) এই অনুকাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্যাপার আর কিছু নয়, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা, বিষয়, 'আমার মা'।

একে একে গল্প পড়ে যাচ্ছে। একটি মেয়ে চমৎকার লিখে এনেছে, 'আমার মায়ের মতো মা পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমার মা আমাকে যেমন ভালবাসে, আমিও মাকে ঠিক সেই রকমই ভালবাসি।'

এইরকম বেশ কিছুটা পাঠ করার পরে ওই মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল, তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমার মা'র হাতের লেখা যাচ্ছেতাই, কি যে সব লিখে দিয়েছে কিছু পড়তে পারছি না.....।'

ডাইজেস্টের এর পরের গল্পটিও অল্প বয়েসী এক কিশোরকে নিয়ে।

ছেলেটির বাবা তাঁর চুয়াল্লিশ বছরের জন্মদিনে সকালবেলা চায়ের টেবিলে চায়ের মধ্যে নিয়মমতো স্যাকারিন না দিয়ে এক চামচ চিনি মিশিয়ে বললেন, 'মনের বয়েসই আসল বয়েস। মনেই হচ্ছে না চুয়াল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে। মনে হচ্ছে আমার বয়েস ত্রিশ বছর।' একথা শুনে ছেলেটির মা হেসে বললেন, 'আমার তো পঁচিশ বছরের বেশি নিজেকে মনে হচ্ছে না।'

এতক্ষণ চৌদ্দ বছরের ছেলে ওমলেট খেতে খেতে মা-বাবার কথা শুনছিল, এবার সে বলল, 'আমারও মনে হচ্ছে আমার বয়েস আঠারো হয়ে গেছে।' মা-বাবা অবাক। মা বললেন, 'আমাদের বয়েস কমলো, তোমার বয়েস বাড়ল কেন?' ছেলে বলল, 'আজ রাতে আমি একটা অ্যাডাল্ট মুভি দেখব।'

জুলাই ১৯১৯ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় পাদপূরণে যে কাহিনীটি উদ্ধৃত হয়েছে সেও অপূর্ব এবং অসাধারণ।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে, 'মেরুদণ্ড কাকে বলে? এর কি কাজ?'

একটি ছাত্র উত্তর লিখেছে, 'মেরুদণ্ড একটি লম্বা জোড়া দেওয়া হাড়, এর ওপর দিকে মাথা থাকে এবং নিচের দিকে থাকে বসার জায়গা।'

পুনশ্চ:

এই সংখ্যাতেই এই চমকপ্রদ প্রশ্নোত্তরটি পাওয়া গেছে।

টিভি'র প্রোগ্রাম বিষয়ে দু'জনের কথা হচ্ছে। প্রথম জন দ্বিতীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেই হাসির প্রোগ্রামটা যেন কখন?'

দ্বিতীয়জন প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে জানতে চাইলেন, 'কোন হাসির প্রোগ্রাম?' প্রথমজন বললেন, 'কেন ওই যে আবহাওয়া বার্তা।'

রিডার্স ডাইজেস্ট (২)

রিডার্স ডাইজেস্টের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় পঞ্চাশ বছর।

যতদূর মনে পড়ে খুব অল্প বয়সে এই পত্রিকাটি আমাদের মফস্বল শহরে আমি দেখিনি। কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে রিডার্স ডাইজেস্ট ইতস্তত দেখেছি।

একটা-দুটো সংখ্যার পাতা ওলটানোর পর ধীরে ধীরে মজে গেলাম। আগে আমাদের দেশে বিলিতি রিডার্স ডাইজেস্ট আসত, বোধহয় বাহান্ন-তিপ্পান্ন সাল থেকে এ দেশেই ছাপা আরম্ভ হল।

প্রথমে চেয়ে চিন্তে ধার করে পড়তাম, ঊনিশশো ষাট সাল থেকে কেনা আরম্ভ করলাম। তখন রিডার্স ডাইজেস্টের দাম ছিল বোধহয় দু'টাকা, সে সময়ে দেশ পত্রিকার দাম চল্লিশ পয়সা, দৈনিক পত্রিকা খবরের কাগজ পনেরো পয়সা। এখন দাম প্রায় বিশগুণ বেড়ে গেছে।

গত বছর দাম হল সাইত্রিশ টাকা, এতদিনে হয়ত চল্লিশ হয়ে গেছে। আমার আর্থিক সামর্থ্য নেই কেনার।

তবে রিডার্স ডাইজেস্ট সাময়িক পত্রিকা নয়। দু-চার মাস এদিক-ওদিক হলে

কিছু আসে যায় না। আজকাল ফুটপাত থেকে পুরনো সংখ্যা কিনি, পাঁচ-দশ টাকায় পাওয়া যায়। তাতেই আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়।

এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলে খুব অন্যায় হবে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি নবনীতা (দেব সেন) যখন পাকাপাকি কলকাতায় ফিরল, 'ভালবাসা' বাড়ি থেকে শ'খানেক পুরনো রিডার্স ডাইজেস্ট এবং বহু বই আমাকে উপহার দিয়েছিল। বইগুলি আমাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতিয়া সন্ধ্যাসংঘের পাঠাগারের জন্যে, ডাইজেস্ট সব আমি নিয়েছিলাম।

আমার 'বিদ্যাবুদ্ধি', 'কাণ্ডজ্ঞান' প্রায় সবই ওই পত্রিকাগুলি থেকে টুকে। আমি যে ধরনের রম্যরচনায় অভ্যস্ত তার অফুরন্ত ভাণ্ডার এই আন্তর্জাতিক পত্রিকা।

রিডার্স ডাইজেস্ট হাল আমলের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা, এ কথা প্রতি সংখ্যার মলাটে লেখা থাকে। এক সময়ে লেখা থাকত প্রচার সংখ্যা তিন কোটি, এখন নিশ্চয় আরও বেশি।

পৃথিবীর সতেরটি ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। হিন্দিতেও হয়, একদা শুনেছিলাম বাংলাতেও হবে। সেটা হয়ে ওঠেনি, হয়ত ভবিষ্যতে হবে।

রিডার্স ডাইজেস্ট নামক একটি পল্লবগ্রাহী, জগাখিচুড়ি পত্রিকা নিয়ে এত আদিখ্যেতা বোধহয় সুখী পাঠকের পছন্দ হচ্ছে না।

তবে গঙ্গারাম আমাকে আশ্বাস দিল, 'এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না। সুধীজন আপনার এসব রচনা মোটেই পড়েন না।'

গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি, তুমি তো পড়ো?'

গঙ্গারাম বলল, 'শুধু পড়ি তাই নয়, লেখককে রসদও সরবরাহ করি। আপনার ওই পত্রিকা থেকে এবারে একটা মজার গল্প পাঠকদের জন্যে এনেছি।'

আমি বললাম, 'গল্পটা শুনি।'

গঙ্গারাম বলল, 'খুব ছোট করে গল্পটা বলি। এক মধ্য বয়সী ভদ্রলোক দিনের পর দিন সকাল-সন্ধ্যা এক পানশালায় গেলাসের পর গেলাস মদ খেয়ে যান। তাঁকে একদিন এক সমপায়ী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা রাতদিন এত মদ খান কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'একজনকে ভোলার জন্যে।'

স্বভাবতই পরের প্রশ্ন হল, 'কাকে?'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর এক চুমুক মদ খেলেন, অনেক ভাবলেন, তারপর মাথা নিচু করে বললেন, 'দেখুন সে যে কে তাই আর মনে পড়ছে না।'

গল্পটা মধুর রসের না করুণ রসের ভাবতে ভাবতে আমার সহসা মনে পড়ে

গেল, আরে এ গল্পটা অনেক ঘুরিয়ে তো একবার আমি লিখেছি।

গঙ্গারামকে এ কথা বলতে সে বলল তা হলে নতুন একটা হোক।

গঙ্গারামের আদেশ শিরোধার্য। ডাইজেস্টের সাম্প্রতিক একটি সংখ্যা থেকে গল্প নয়, একটি উপদেশ পেশ করছি।

'কুকুর যতই বিশ্বস্ত হোক, তাকে খাবার পাহারা দেবার দায়িত্ব দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'
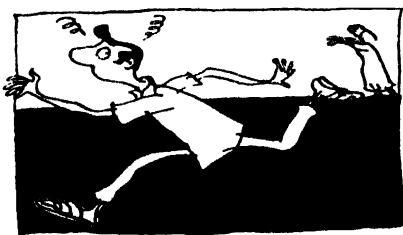
যৎকিঞ্চিৎ গঙ্গারাম

সম্প্রতি একটি অভিযোগ উঠেছে যে আমি নাকি গঙ্গারামের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে বেশ কিছু অবহেলা করছি।

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আমি আমার প্রতিবাদ সরবে জানাচ্ছি, এই রচনাটিই তার নমুনা। তবে আমার ভাঁড়ার প্রায় শূন্য, ভবিষ্যতে গঙ্গারামকে বেশ কিছুকাল গ্রীনরুমে থাকতে হতে পারে, মঞ্চে সুযোগ হবে না।

অতঃপর গঙ্গারামের গল্পগুলি বলি, দুয়েকটি হয়ত আগেও বলেছি, আজকাল সে আমার মনে থাকে না, মনে রাখার চেষ্টাও করি না।

প্রথমে গঙ্গারামের বিয়ের আগের একটা কাহিনী।

যৌবনোচ্ছলা, প্রাণচঞ্চলা শ্যামলীর সঙ্গে তখন গঙ্গারাম প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। অবশ্য গঙ্গারাম একা নয়, আরও বেশ কয়েকজন শ্যামলীর প্রেমে তখন মুহ্যমান।

গঙ্গারামকে শ্যামলী তার বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিল, বালিগঞ্জে লেকের কাছে বাড়ি। আগেই শ্যামলীকে বলা ছিল, একদিন সন্ধ্যাবেলা খুঁজে খুঁজে কেয়াতলার গলিতে সেই ঠিকানায় গঙ্গারাম পৌঁছল।

কলিংবেল বাজাতে বর্ষীয়সী এক মহিলা এসে দরজা খুললেন। গঙ্গারামকে দেখে 'কি চাই' জিজ্ঞাসা করার পর গঙ্গারাম শ্যামলীর কথা বলল।

বৃদ্ধা সেই শুনে বললেন, 'একটু দাঁড়াও', বলে গঙ্গারামকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। গঙ্গারাম ধরে নিল, এইবার হয়ত শ্যামলীকে পাঠিয়ে

দেবে।

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শ্যামলী নয়, এই বৃদ্ধা মহিলাই আবার বেরিয়ে এলেন। চোখে গোল কাচের চশমা আর হাতে একটা খাতা।

চোখে চশমা লাগিয়ে খাতা খুলে বৃদ্ধা বললেন. 'শ্যামলী বাসায় নেই। আমি শ্যামলীর ঠাকুমা, আমাকে যাওয়ার সময় সে তোমাকে বলতে বলেছিল—

'তুমি যদি অপূর্ব হও, 'জীবন যুদ্ধ' কাগজে তোমার গল্প 'হায় ভালবাসা' ওর মোটেই ভাল লাগেনি।

'তুমি যদি সেলিম হও, তবে তোমাকে কাল দুপুরে তিনটেয় নন্দনের সামনে দাঁড়াতে বলেছে।

'তুমি যদি হাবুল হও, তোমার উপহার খুব পছন্দ হয়েছে, বিশেষ করে সবুজ পান্নার আংটিটা, মেনি থ্যাঙ্কস্।

'তুমি যদি বৃন্দাবন হও....'।

ততক্ষণে গঙ্গারাম অস্থির হয়ে উঠেছে। সে ঠাকুমাকে থামিয়ে বলল, 'আমার নাম গঙ্গারাম। দেখুন তো আমার নামটা কোথাও আছে নাকি?'

একটু উলটে পালটে দেখে নিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'এখানে তো নেই। দাঁড়াও তো বাবা আরও একটা খাতা আছে।' তিনি আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন।

কিন্তু গঙ্গারাম আর দাঁড়াল না। আর কখনও শ্যামলীর খোঁজ করেনি।

অবশ্য এর থেকেও অনেক বেশি গোলমালে গঙ্গারাম পড়েছিল।

তখন জয়জয়ন্তী সরকারের সঙ্গে তার খুব ভাব। রীতিমত গদগদ ভাব। জয়জয়ন্তীই আহ্লাদ করে একদিন গঙ্গারামকে বলেছিল, 'তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে এস। মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

এ রকম প্রস্তাবের অনেক গভীর মানে। ফলে অনতিবিলম্বে বেশ সেজেগুজে গঙ্গারাম জয়জয়ন্তীদের বাড়িতে গেল।

সেখানে সেকি অভ্যর্থনা। গঙ্গারামকে নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকতেই এক সঙ্গে ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে জয়জয়ন্তীর বাবা-মা বেরিয়ে এলেন। গঙ্গারামকে দেখে সে যে কে সে বিষয়ে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা না করে জয়জয়ন্তীর মা গঙ্গারামকে বললেন, 'রাস্কেল বদমাইস কোথাকার, জুতো পিটিয়ে তোমার দাঁত ভেঙে দেব।' জয়জয়ন্তীর বাবা আরও এক কাঠি ওপরে, তিনি বললেন, 'তোমার মতো শয়তানকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করা উচিত। এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরোও, না হলে থানায় ফোন করব।'

জয়জয়ন্তী বোধহয় সাজগোজ করছিল। মা-বাবার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ম্যাক্সি পরে বেরিয়ে এল। এসেই গঙ্গারামকে দেখে উত্তেজিত মা-বাবাকে থামিয়ে

দিয়ে বলল, তোমরা কি করছ। ও তো নীলকান্ত নয়, ও গঙ্গারাম, ও তো আমার সঙ্গে কোনও বদমায়েসি করেনি।'

ততক্ষণে গঙ্গারাম দ্রুতবেগে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, ফুটপাথে নেমে সে বড় রাস্তার দিকে ছুটতে লাগল। জয়জয়ন্তীও বেরিয়ে এসে পেছনে পেছনে, 'গঙ্গা, এই গঙ্গা', বলে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু এরপর গঙ্গারাম আর দাঁড়ায়!

বড় সাহেবের চিন্তা

প্রতি শনিবারের মতোই এই শনিবারের সন্ধ্যাতেও বড় সাহেব ক্লাবে এসেছেন। কিন্তু তাঁকে কেমন বিপর্যস্ত, চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

বড় সাহেব গুরুগম্ভীর ব্যক্তি, সকলে তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় ক্লাবে সবাই একটু খোলামেলা। বড় সাহেবকে একজন সাহস করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'স্যার, কি কোনও কারণে চিন্তিত?'

বড় সাহেব বললেন, 'চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। ঘোড়ার চিকিৎসার এত খরচ কে জানত?'

ঘোড়া? এর মধ্যে ঘোড়া এল কোথা থেকে? এই শহরে বড় সাহেব ঘোড়া দিয়ে কি করেন? রেসের জকি, আর কলকাতার শেষ কয়েকটি ফিটন গাড়ির সহিস ছাড়া একালে আর কারো কি ঘোড়া আছে?

না। কলকাতায় নয়। ঘটনাস্থল দার্জিলিং। এই গ্রীষ্মে বড় সাহেবের স্ত্রী সেখানে বেড়াতে গেছেন।

বড় মেমসাহেব একদা তন্বী ছিলেন। এখন তিনি বিশালাকায়া, ওজন অন্তত আড়াই মণ। এগারো হাত সাড়ে এগারো হাত শাড়িতে এখন আর তাঁর হয় না। থান কেটে ছয় মিটার, কমপক্ষে তের হাতি শাড়ি না হলে তাঁর পক্ষে আবরু বজায় রাখা অসুবিধে।

সে যা হোক, বড় মেমসাহেব এবার দার্জিলিং গেছেন মূলত মেদ কমাতে। ওই

শৈলশহরে ডাঃ বাহাদুর বহুদিনের প্রবীণ চিকিৎসক। তাঁর স্পেশালিটি হল মোটাকে রোগা করা এবং রোগাকে মোটা করা।

বড় মেমসাহেবকেও ডাঃ বাহাদুর দেখেছেন। তাঁকে বলেছেন ঘোড়ায় চড়তে। সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা নিয়ম করে ঘোড়ার পিঠে নিয়মিত ছুটতে হবে।

দার্জিলিংয়ের ম্যালে অনেক ঘোড়া আছে, সহিস আছে, তারা টুরিস্টদের ঘোড়ায় চড়িয়ে রুজি-রোজগার চালায়। কিন্তু তারা কেউই বড় মেমসাহেবের বিশাল বপু দেখে তাদের ঘোড়ার পিঠে বসাতে সাহস করেনি।

অবশেষে দু'সপ্তাহ আগে বড় সাহেব স্বয়ং দার্জিলিং গিয়ে একটা তাগড়া পাহাড়ি ঘোড়া কিনে মেমসাহেবকে দিয়ে এলেন।

এর পরের খবর ভয়াবহ।

মেমসাহেব দু'চারদিন ঘোড়াটায় চড়েছিলেন, কিংবা বলা চলে চড়ার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষিত ঘোড়া কষ্ট করে যতটা সম্ভব মেমসাহেবকে বহন করেছিল। কিন্তু শেষে ঘোড়াটা আর পারেনি। মেমসাহেব তার পিঠে উঠলেই সে বসে পড়ে। আর্ত কণ্ঠে চিঁচিঁ চিৎকার করে। ইতিমধ্যে ঘোড়ার ওজন অর্ধেক হয়ে গেছে। মেমসাহেবের ওজন এক ছটাকও কমেনি বরং শৈলশহরের জল-হাওয়া মাখন-আইসক্রিম খেয়ে পাউন্ড দশেক বেড়েছে।

এই খবর পেয়ে বড় সাহেব স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন ঘোড়াটাকে চিকিৎসা করাও।

বড় মেমসাহেব আজকের ডাকে সেই চিকিৎসার খরচের বিল পাঠিয়েছেন। ঘোড়ার দাম ছিল আটচল্লিশ হাজার টাকা। আর ঘোড়ার চিকিৎসার দৈনিক খরচ সাত হাজার টাকা করে ছয়দিন তাছাড়া, এক্স-রে, ইসিজি, ব্লাড টেস্ট বাবদ থোক নয় হাজার টাকা। পুরো একান্ন হাজার টাকা বিল এসেছে।

বড় সাহেব বড় মেমসাহেবকে ফোনে জানিয়েছেন, 'ঘোড়া ফেলে এখনই এক বস্ত্রে দার্জিলিং থেকে পালিয়ে এস।'

কিন্তু বড় মেমসাহেব সেটা পারবেন কি? আজই তো এসে যাওয়া উচিত ছিল। আজ এখনো তিনি আসেননি।

বড় সাহেব বড় চিন্তায় আছেন।

এই পর্যন্ত লিখে ভাবছিলাম, গল্পটা আর একটু বড় করবো কি না কিন্তু তার জন্যে বড় মেমসাহেবের পালিয়ে থাকা দরকার।

ইতিমধ্যেই গঙ্গারাম আমার প্যাডে কাহিনীটা পড়ে ফেলেছে এবং বাধ্য হয়ে তাকে আমার সমস্যাটার কথাও বলেছি। গঙ্গারাম সাফ বলল, 'ঘোড়ার অসুখের খরচ না মিটিয়ে বড় মেম পালিয়ে আসতে পারবে না। তার চেয়ে অন্য একটা পালানোর গল্প বলছি, সেটা আপনি লিখুন।'

অগত্যা আমি বললাম, 'বলো।'

গঙ্গারাম বলল, 'এবার শীতে কেরালায় গিয়েছিলাম। সেখানে গ্রামের ভিতরে বিশ্ববিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়। যে কোনও ধরনের পঙ্গুত্বের ওরা ভেষজ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করে। আমি কলকাতা থেকে গিয়েছি বলে, তারা বলল, 'আপনাদের কলকাতার এক রোগীর গল্প বলি শুনুন। ভদ্রলোক চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গু। হাঁটতে পারেন না, নড়াচড়া করতে পারেন না। স্ট্রেচারে করে আমাদের এখানে এলেন। বললেন, 'ভাল হবো?' আমরা বললাম, 'অবশ্যই। তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন, হাঁটবেন, দৌড়াবেন, লাফাবেন। তিন মাসের চিকিৎসা আর থাকা-খাওয়ার খরচ পঁচিশহাজার টাকা', ভদ্রলোক বললেন, ভাল হলে তখন দিয়ে যাবেন। তিন মাস পূর্ণ হওয়ার দু'দিন আগে সেই ভদ্রলোক গভীর রাতে দোতলায় তার ঘর থেকে নেমে পালিয়ে গেছেন।'

আমি বললাম, 'সর্বনাশ'! গঙ্গারাম বলল, 'সর্বনাশ আবার কি। পালাতে গেলে, এভাবেই পালাতে হয়। নাদুস-নুদুস বড় মেম পারবে?'
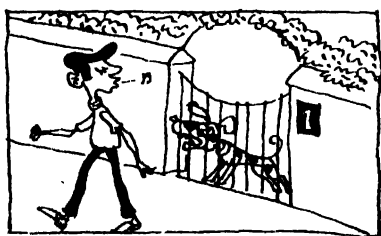
বনফুল (এক)

বনফুল শতবর্ষ অতিক্রান্ত হল। খুব যে একটা হৈচৈ, মাতামাতি হল তা নয়, কিন্তু একটা কথা বোঝা গেল শ্রীমধুসূদনের নাট্যকারকে স্থাবর-জঙ্গমের লেখককে, বাঙলা অনু গল্পের জনককে বাঙালি পাঠক আজও ভালবাসেন, এখনো পছন্দ করেন।

আমি বনফুলের চির অনুগত ভক্ত। তিনি আমার মহাগুরু। পূর্ববঙ্গের সুদূর মফস্বল শহরে প্রায় জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তাঁর লেখার সঙ্গে আমার ভালবাসা। স্থানীয় পাঠাগারের মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর বিচিত্র সব গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং রঞ্জন পাবলিশিং (শনিবারের চিঠির প্রকাশনায়) থেকে প্রকাশিত বনফুলের বই আমি গোগ্রাসে গিলেছি।

একটা বয়েস পর্যন্ত বনফুলের লেখা যখন যেখানে যেমন পেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলেছি। বহু সময়েই আমার রচনায় তাঁর প্রভাব আমি অনুভব করেছি। আমার একটি রচনার নাম 'বলাবাহুল্য'। বনফুলই এই নামকরণের উৎস বলা=বলাই=বলাইচাঁদ=বনফুল। বনফুল নিজের নাম নিয়ে রসিকতা করেছিলেন 'বলাই বাহুল্য', এ রকম রসিকতা বনফুলের পক্ষেই সম্ভব।

বনফুলকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম না, তাঁকে কখনো চোখে দেখিনি। তবু তাঁর স্মৃতিতর্পণ না করলে পাপ হবে, এই রচনা সেই পাপস্খালনের প্রয়াস মাত্র।

বনফুলের সাহিত্যকীর্তি, তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আপাতত তাঁর কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা একালের পাঠকদের জন্যে পেশ করছি।

বনফুলের বিখ্যাত কবিতা, 'শালা'। কবিতাটি তৎকালীন পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছিল এমন কি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক এর পরে 'শালী' নামে একটি কবিতা রচনা করেন, সে কবিতাও বিখ্যাত হয়।

বনফুলের 'শালা' কবিতার প্রথম স্তবক,

'সামান্য মনুষ্য নহ,
নহ শুধু গৃহিনীর ভ্রাতা
হে শ্যালক, হে স্বভাব শালা,
বঙ্গদেশে বহুবেশে
বহুবার দেখেছি তোমাকে.
রচিয়াছি তব জয়মালা।'

এ কথা স্মরণীয় যে কবিতা লিখেই একদা বনফুল সাহিত্যের উঠোনে প্রবেশ করেছিলেন। 'বনফুলের কবিতা' নামে তাঁর কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সনে। এর ছয়-সাত বছর পরে বেরায় তাঁর উপন্যাস ও গল্পের বই।

বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতাগুলির একটা বড় অংশ নিতান্ত তামাশা, তৎকালীন এক জাতীয় আধুনিক কবিতাকে বিদ্রুপ করে রচিত।

'ক্ষমা করুন ১৯৪১ দেবী
খিলছি বকিতা ....

লক্ষ্য করুন দ্বিতীয় পংক্তিতে লিখছি উলটিয়ে খিলছি এবং কবিতা উলটিয়ে বকিতা করা হয়েছে। এই কবিতাতেই আছে,

'রোদ   o
জ্যোৎস্না   + ?

প্রদোষ   x !

এবং অথচ রেকারিং।'

বিদ্রুপাত্মক পদ্যের পাশাপাশি বনফুল লিখেছেন অসংখ্য অসামান্য সরস কবিতা।

দুপুরবেলায় নির্জন গলিতে প্রেমিক এসে প্রেমিকার উদ্দেশ্যে শিস দিচ্ছে। দু'পংক্তি কাব্যে পরিণতি ভয়াবহ—

'ফাঁকা গলি, শিস দিনু নীরব দুপুর
বাতায়ন খুলিল না, আসিল কুকুর।'

বনফুল ছিলেন বিহারবাসী বাঙালি, বিহারি বাঙালিরা বিহার না বলে বলেন বেহার।

এই বেহার নিয়ে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের প্যারোডি রচনা করেছিলেন। দেহাতি হিন্দিতে তার সঙ্গে বাঙলা মিশিয়ে অসামান্য রচনা—

'বেহার আমার, মাসীমা আমার
ধাইমা আমার, আমার দেশ
কাহে গো মাইয়া এই সা হালৎ
কাহে গো তোর এমন বেশ।'...

এরকম পরিহাস করার সাহস একালে আর কারো নেই। একদা বনফুলের ছিল।
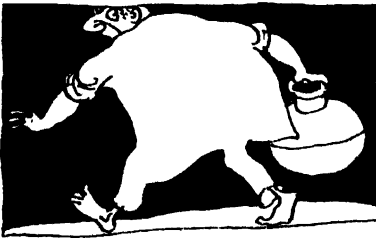
বনফুল (দুই)

এমন অনেক রচনা আমরা পাঠ করি যা পড়ে আমরা খুশি হই, আনন্দিত হই। অনেক রচনা আমাদের হৃদয় ব্যথাতুর করে, চোখ অশ্রুসজল করে তোলে।

বনফুলের রচনায় আনন্দ-বেদনা সবই পেয়েছি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা পাঠ করে শিক্ষিত সাবালক হয়েছি। কত বিচিত্র রকমের মানুষের চরিত্র, কত ঘটনা দুর্ঘটনার মুখোমুখি বনফুল আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে অভিজ্ঞ

করেছেন।

বনফুলের অমর উপন্যাস 'জঙ্গম' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। পরবর্তী খণ্ডগুলি ১৯৪৫ সালের মধ্যে। তখন আমার বয়স দশের কোটা পেরোয়নি। এর দু-তিন বছরের মধ্যে আমি ওই বইগুলি পাঠ করি টাঙ্গাইল রমেশচন্দ্র হল অ্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরির দৌলতে। সে পাঠাগারের সহসম্পাদক এবং পরে সম্পাদক ছিলেন আমার বাবা। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বই পাঠাগারের জন্যে কলকাতা থেকে আনাতেন। বাংলা কথা সাহিত্যের সে ছিল সুবর্ণযুগ। প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব, দুই বিভূতি, তারাশংকর, প্রবোধ, শরদিন্দু এবং বনফুল।

তা বনফুলের 'জঙ্গম' পড়েছিলাম হয়ত তের বছর বা বারো বছর বয়েসে। কি পড়েছিলাম, কি বুঝেছিলাম, কি জানি? কিন্তু বারবণিতা মুক্তো আর শঙ্কর, তাদের আমার আজও মনে আছে। জঙ্গম বইটা বহুকাল পড়িনি। অন্তত চল্লিশ বছর কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে জঙ্গমের মুক্তো আমার প্রথম প্রেমিকা, বনফুলের হাত ধরেই আমার যৌবনোন্মেষ হয়েছিল।

এর বছর দশেক পরে 'স্থাবর' পড়েছিলাম। নাম-পরিচয়হীন, খ্যাতি-প্রতিপত্তিহীন আদিম মানুষের কাহিনী, তখন যে ভাষা ছিল, 'তাহা ইঙ্গিতের, চাহনির, তাহা লিপিবদ্ধ করা যায় না।'

....'তখন কাহারও কোনও নাম ছিল না। তখন আমরা সকলেই ছিলাম নামগোত্রহীন।'

এরই পাশাপাশি বনফুলের অবিস্মরণীয় কতিপয় ছোটগল্প স্মরণ করি। বেশি গল্পের সুযোগ নেই। দুটো রেলগাড়ির গল্প বলি।

গ্রাম্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তি শ্রীপতি সামন্ত থেলো হুঁকো হাতে এবং গুড়ের হাঁড়ি, তরমুজ, শালপাতা, পোঁটলা ইত্যাদি নিয়ে ট্রেনের ফার্স্টক্লাসে উঠেছেন একটু নিদ্রার জন্যে। কামরার অন্য যাত্রীর সাহেবি পোশাক, মুখে পাইপ, তবে বাঙালি। তিনি বললেন, 'দ্যাট কানট্ বি। আই কানট্ এলাউ।' কিন্তু অতিরিক্ত ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ায় চেকার কিছু করতে পারলেন না। অবশেষে দেখা গেল এই সাহেবি বাঙালির নিজেরই কোন টিকিট নেই। সে একজন জোচ্চোর। চেকারের সঙ্গে ওই নিয়ে তর্ক-বিতর্কে শ্রীপতির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি পাঞ্জাবি চেকার ওই লোকটিকে উপলক্ষ্য করে বাঙালি জাতকেই গাল পাড়ে। শ্রীপতি নিজেই টাকা দিয়ে সহযাত্রীর ভাড়া মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'বাড়তি মাশুল'।

হারিয়ে যাওয়া ছেলের সঙ্গে মুখাবয়বের মিল দেখে ভুলবশত ট্রেনে করে অন্য

লোককে অনুসরণ করে পুত্রহীন পিতা। অনুসরণ করতে করতে সে গন্তব্যস্থল পেরিয়ে যায়।

অবশেষে তার ভুল ধরা পড়ে। তখন গন্তব্যস্থলে গিয়ে ফিরে আসতে বাড়তি মাশুল দিতে হয়।

লৌকিক-অলৌকিক বনফুলের মতো এমন সর্বত্রগামী লেখনী বাংলা সাহিত্যের পক্ষে বিস্ময়কর।

সাহিত্য গবেষণার কাজে বনফুলের রচনা আলিবাবার গুহার মতো। অমূল্য ধনরত্ন তার মধ্যে রয়েছে।

আমার ক্ষমতায় সে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আমি আপাতত বনফুলের কাছে আমার বিবেকের ঋণ শোধ করার চেষ্টা করি গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করে, বনফুলকে উদ্ধৃত করে—

'একটা ভীষণ দর্শন বলিষ্ঠ লোক কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাতে প্রকাণ্ড এক কলসী।

প্রশ্ন করিলাম, কি খুঁজিতেছেন?

আমার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, দড়ি।

দড়ি? আপনি কে?

তোমার বিবেক, রাস্কেল।'

অম্ল মধুর

প্রথমে ড্যাফল দিয়ে শুরু করি। কিছুকাল আগে আমি ড্যাফল নিয়ে একটা রচনা লিখেছিলাম। আমার অধিকাংশ রচনার মতোই সে লেখাও কেউ নিশ্চয় পড়েন নি।

তাই, জিজ্ঞাসা করছি, আপনারা কেউ ড্যাফল নামে কোন ফলের কথা শুনেছেন? ড্যাফল দেখেছেন? ড্যাফল খেয়েছেন?

আমার জ্ঞাতসারে ড্যাফলই সবচেয়ে টক ফল। সে যে কি বিষম টক যে খায়নি

তাকে বোঝানো যাবে না। একটু জিবে ছোঁয়ালে সারা শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে।

টকের প্রতি আমার আবাল্য লোভ। শিবরাম চক্রবর্তী শুনলে বলতেন, 'তুমি সত্যিই টকেটিভ (Talkative)।' টকে আমার প্রবল স্পৃহা, মুখ কুঁচকিয়ে, জিবে-মুখে লালা ঝরিয়ে অভব্যর মতো তেতুলের আঁচার কিংবা ঝাল নুন দিয়ে টোপাকুল বা কাঁচা আম খাওয়ার এই পড়ন্ত বয়সেও আমার লোভ বিন্দুমাত্র কমে নি।

খাওয়ার পাতে অন্ন-ব্যঞ্জন যত উৎকৃষ্টই হোক, আমি অপেক্ষা করি, চাটনি বা অম্বলের জন্য।

একদা এক পণ্ডিতকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'চাটনি আর অম্বল কি একই জিনিস?' তিনি বলেছিলেন, 'চাটনি একটু বেশি মিষ্টি, কম টক আর অম্বল হল বেশি টক, কম মিষ্টি।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, এই চার রকমের মধ্যে চাটনি হল চোষ্য, আর অম্বল হল লেহ্য।'

এত জটিলতা আমার পোষায় না। তবে এটুকু বলতে পারি পূর্ববঙ্গে চাটনি ছিল না, আমরা খেতাম অম্বল। সেই অম্বলই পশ্চিমবঙ্গে চোঁয়া-ঢেকুর।

সমস্যাটা পরে অনুধাবন করেছি। আসলে অম্ল হল অ্যাসিড (Acid) ভাতের পাতের প্রান্তে যে অ্যাসিড সেটাও অম্বল, এটা সেটা খাওয়ার ফলে যে অ্যাসিড সেও অম্বল।

সে যা হোক শুধু ড্যাফল বা কাঁচা আম, টোপাকুল বা তেঁতুল নয় সব রকম টকে এখনো আমার আগ্রহ।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নায়িকার চোখ বেতের ফলের মতো কিন্তু কেউ কখনো বেত ফল খেয়েছেন, বেতের কাঠায় (কাঠা-ছোটধামা-বাটি) তেল-কাসুন্দি মাখা পাকা বেতফল? গোল গোল লালকোয়া লট্‌কা? ঝলমলে হলুদ কামরাঙা লঙ্কাগুঁড়ো নুন দিয়ে জড়ানো?

স্বদেশে বিদেশে কত টক ফল যে খেয়েছি। টক প্লাস, অম্লমধুর, নাসপাতি, শুকনো প্রুণ, নানা রকম টক আমি চেখে দেখেছি।

টক এখন সাহেবি খাদ্য তালিকায় ঢুকে গেছে। চাটনি রীতিমত ইঙ্গ-মার্কিন শব্দ (Chutney) আমি সাহেবি হোটেলে কেতাদুরস্ত মহিলাকে শপ্ শপ্ করে চাটনি চামচে করে মুখে তুলে চেটে খেতে দেখেছি।

টক, অম্বল এবং চাটনি এই তিনটে কিন্তু এক জিনিস নয়। অম্বল একটু বেশি জোলো, চুমুক দিয়েও খাওয়া যায় না। তাতে টক মিষ্টির ভাগ প্রায় সমান সমান। খাওয়ার শেষেই অম্বল খায়, সেটাই বিধি।

চাটনি কিন্তু ভাজা বা মাছ-মাংসের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া চলে। এতে মিষ্টির ভাগই বেশি, টকের একটা প্রলেপ থাকে। ব্যাপারের বাড়িতে খাওয়ার শেষে পাঁপর

ভাজার সঙ্গে চাটনি পরিবেশন আজকাল প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেকে বলে খাওয়ার শেষে এই পাঁপর-চাটনি খেলে হজম ভাল হয়। আমার কিন্তু অনেক সময়েই এই কম্বিনেশন্ খেয়ে অম্বল হয়েছে। বলা যেতে পারে, চাটনি খেয়ে অম্বল হয়েছে।

আপাতত টকের কথা থাক।

টক-মিষ্টি নিয়ে সুরসিক হিমানীশ গোস্বামী মহোদয়ের একটা মজার পরামর্শ আছে। সেটা জানাচ্ছি।

পরামর্শটি গোস্বামী মশায় কোথাও লিখিত ভাবে দিয়েছেন কিনা জানি না, তবে আমি তাঁর স্বমুখে শুনেছি।

এই পরামর্শের সঙ্গে দুটি বিষয় ঝালিয়ে নিতে হবে। প্রথম হল টক কিছু খেলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মুখ কুঁচকিয়ে যায়, মাস্তানি ভাষায় মুখের জিওগ্রাফি বদলিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিষয় হল, বাড়িতে বাড়িতে ফলওয়ালা বিশেষ করে আমের সময়ে আমওয়ালা ঝুড়ি মাথায় ফল ফেরি করে। সে আম কেটে টেস্ট করায়, মিষ্টি না টক।

গোস্বামীমশায়ের পরামর্শ ঠিক এখানে।

তিনি উপদেশ দিয়েছেন আমওয়ালা আপনাকে আম কেটে টেস্ট করতে দিলে, আম যতই মিষ্টি হোক, আপনি চেষ্টা করে মুখমণ্ডলী কুঞ্চিত করে মুখে টক ভাব ফুটিয়ে তুলবেন। কিন্তু আমটা হাতছাড়া করবেন না। গৃহিনীকে মুখে বলবেন, 'সুইট, সুইট।'

টেনশনের ওষুধ

টেনশনে সবাই ভোগে। যেমন লো হোক, কিংবা হাই হোক, সকলেরই রক্তচাপ থাকে, তেমনই টেনশনও সকলেরই থাকে, কম বা বেশি, সাময়িক বা ধারাবাহিক।

অবশ্য অবসর গ্রহণ করার পর থেকে আমার, নিজের তেমন কোন টেনশন

নেই। চাকরি করার সময়ে সকলেরই যেমন হয় মাঝেমধ্যে, কারণে-অকারণে অল্পবিস্তর টেনশনে ভুগেছি।

এখন যে ধরনের টেনশন হয় সেটা হল রেলগাড়ি ধরতে গেলে কিংবা বিমানে চাপলে। সপ্তাহান্তে প্রবাসী ছেলের ফোন না এলেও উদ্বেগ হয়।

আরেকটা বাৎসরিক টেনশনের ব্যাপার আছে। সেটা পুজো সংখ্যার লেখা নিয়ে। প্রায় সব কাগজেই লিখি, লিখতে ভাল লাগে, সবাইকে কথাও দিই। কিন্তু শেষের দিকে লেখার চাপে দিশেহারা হয়ে যাই। উদ্বেগ, অশান্তি। রাত জাগতে পারি না, তাই সারাদিন মাথা গুঁজে লিখতে হয়। ফোন এলে বা কলিংবেল বাজলে চিন্তায় পড়ি এ বুঝি তাগিদ এল।

আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি টেনশনে ভুগেছিলাম ১৯১৯ সালে। ২৯ জুলাই তারিখে। বলা বাহুল্য ওইটি আমার বিয়ের দিন। মানিকতলায় বিয়ে, আমাদের পুরনো কালিঘাটের বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিলাম। তখন টেনশনে আমার উঁচু তারে বাঁধা সেতারের মতো অবস্থা।

গাড়ি চালাচ্ছিল আমার মাসতুতো ভাই রঞ্জন। তার পাশের সিটে কবি দীপক মজুমদার। পেছনের সিটে আমি আর শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। গোধূলি লগ্নে বিয়ে, বিকেল-বিকেল রওনা হয়েছিলাম। সেদিন শঙ্কর বার বার আমাকে উৎফুল্ল করার চেষ্টা করছিল।

প্রয়াত শঙ্কর, তখনকার খ্যাতনামা তরুণ কবি হলেও চেহারায়, চাল চলনে, পোশাক-আশাকে ছিল ফার্স্টক্লাস বরযাত্রী। তাঁর অনেক বাস্তববুদ্ধিও ছিল।

গাড়িতে উঠে রওনা হয়েছি, শঙ্কর খেয়াল করল আমার গলায় কোন ফুলের মালা নেই। সে রঞ্জনকে বলে, গাড়ি ঘুরিয়ে প্রথমে কালীঘাট বাজারে গেল। বর্ষাকাল, বাজারে ফুলের মালার অভাব নেই। শঙ্কর বাছাই করে একটা মোটা বেলফুলের মালা কিনল। কিনে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পরিয়ে দিল। আমি শক্ত হয়ে মালাখানি গলায় চেপে ধরে বোকার মতো বসে রইলাম।

শক্ত করে ধরার জন্যই হোক কিংবা মালার সুতো পলকা বলে—হাজরা মোড় পেরোতে না পেরোতে মালাটি ছিঁড়ে গেল। আমি অপ্রস্তুতভাবে বললাম, 'ও কিছু নয়। মালায় গিঁট দিয়ে নিলেই হবে।'

সামনের সিট থেকে দীপক প্রতিবাদ করল, 'দূর! ছেঁড়া, গিঁট দেওয়া মালায় বিয়ে হয় নাকি?'

অগত্যা গাড়ি থামল জগুবাবুর বাজারে। শঙ্কর ছুটে গিয়ে আরেকটা বেশ শক্ত গোছের মালা টেনে-টুনে দেখে কিনে নিয়ে এল। সেটা গলায় পরলাম।

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে আচমকা একটা গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে রঞ্জন ব্রেক

কষল। এক হাত দিয়ে সন্তর্পণে আমি মালা ধরেছিলাম, হঠাৎ ঝাঁকিতে মালাটা হাতের টান লেগে ফট করে ছিঁড়ে গেল। শঙ্কর বলল, 'আবার ছিঁড়লি!'

এবার নিউ মার্কেট। আবার মালা গলায় দিতে গেলাম। দুঃখের বিষয় এবার মাথা গলানোর আগেই মালাটা ছিঁড়ে গেল!

এরপর বউবাজার এবং কলেজস্ট্রিটেও ফুলের দোকান ছিল। কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করে সে সব জায়গা থেকে আর মালা না কিনে মানিকতলা বাজার থেকে মালা কেনা হল। সেটা শঙ্করের হাতে রাখা হল। বিয়েবাড়ির দরজায় গাড়ি থামতে শঙ্কর মালাটা হাতে নিয়ে আমাকে বলল, 'ঘাড়টা নামা।' আমি ঘাড় নামালাম, নামানোর সময়ই আমার বড় মাথাটা প্রসারিত মালার মধ্যে আটকিয়ে গেল, আরেকবার ফট করে শব্দ হল। এ মালাটাও ছিঁড়ল, পদপ্রান্তে ফুল ঝরে পড়ল।

এই শেষ নয়, বিয়ের সময়েও স্ত্রীর সঙ্গে যখন মালাবদল হয় আমার মালাটি মিনতির গলায় চমৎকার চলে গেল, কিন্তু তাঁর মালাটি তিনি যখন আমাকে গলায় পরাতে যাচ্ছিলেন আমি সৌজন্যবশত সেটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিজেই পরতে গেলাম। এবারও মালা পরা হল না, ছিঁড়ে গেল।

এই ছিন্ন মালার কাহিনী অবশ্যই টেনশনপ্রসূত। তবে এই বিয়ের রাতেই আমি অন্য একটা কাজ করি। বিয়ের মন্ত্র বলার সময় যখন মুখে বলছি, 'যদিদং হৃদয়ং মম', মনে মনে বলছি, 'যদিদং টেনশনং মম।'

এই মন্ত্র বলে অনেকটা টেনশন সেদিন ঘাড় থেকে নামিয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ জীবনেও টেনশন, উদ্বেগ, অশান্তি স্বামী-স্ত্রী দুজনে ভাগ করে নিয়েছি। উপকার পাইনি তা বলতে পারব না।

পুনশ্চ:

টেনশন ব্যামোর একটি ব্যবস্থাপত্র আমার কাছে আছে। ইচ্ছে করলে, যে কেউ ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

এক পাতা সাদা ফুলস্কেপ কাগজ নিন। বাচ্চাদের রঙিন পেনসিলের একটা বাক্স জোগাড় করুন। কাগজের ওপর দিকে পাহাড় আঁকুন, মোটা রঙের পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ার ফাঁকে লাল রঙের সূর্য। আকাশের রঙ ফিকে নীল, সেখানে ডানা ছড়ানো সাদা পাখি।

পাহাড়ের নিচে সবুজ বন। তার নিচে সবুজ জলের নদী। সবুজ বনের ছায়া পড়ে নদীর জলও সবুজ। নদীর জলে নৌকো, হলুদ রঙের নৌকোর পালে পাঁচমিশেলি রঙ। জলের মধ্যে সাতরঙা বড় বড় মাছ।

কাগজের নিচে এখনও অনেকটা জায়গা রয়েছে। যতক্ষণ না টেনশন একটু

কমে সবুজ জল আর রঙিন মাছের পরিমাণ বাড়িয়ে যান। এক সময় টের পাবেন, ভাল লাগছে।

আসলে টেনশনের অব্যর্থ ওষুধ ভাল লাগা।
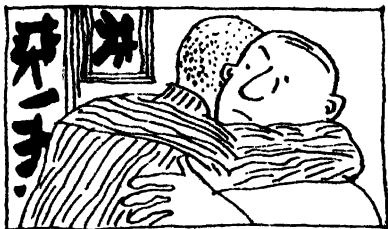
প্রবাসী

মহাভারতের মহাকবি একটি চিরকালীন জিজ্ঞাসা আবহমান কালের পাঠকের কাছে রেখে গেছেন।

জিজ্ঞাসাটি, সবাই জানেন, সুখী কে?

ধর্মরাজ যম ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সুখী কে?'

যুধিষ্ঠিরের সেই বিখ্যাত উত্তর নিশ্চয় সকলে মনে রেখেছেন। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, 'সেই সুখী যে অঋণী এবং অপ্রবাসী।' এই নিবন্ধ রচনা করছি সুদূর বিদেশে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে শহরের শহরতলির এক বাড়িতে বসে। হাতের কাছে মহাভারত নেই, সুতরাং গোড়ার উপস্থিতিতেই কিছু ভুল হয়ে গেল কি না বুঝতে পারছি না। যদি মহাভারতীয় প্রসঙ্গে কোনও ভুল হয়ে থাকে, পাঠক-পাঠিকা নিজগুণে সংশোধন করে নেবেন।

আমি বরং আরো কাছে চলে আসি। উনবিংশ শতকে।

'সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ'....

বাঙালির হৃদয়ের কবি মধুসূদন তাঁর প্রবাস জীবনকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে লিখেছিলেন 'রেখো মা দাসেরে মনে।' এই পংক্তিটি বহুকাল ধরে বাঙালির ঘরের দেয়ালে কাচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙানো ছিল, এখনো হয়ত কোথাও কোথাও আছে।

এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ভাগ্যবান ছিলেন। 'আপন মাধুর্য রসে', রবীন্দ্রনাথের প্রবাসের দিনগুলি নারী পূর্ণ করে দিয়েছিল। এ শুধু দক্ষিণ আমেরিকার ভিক্টোরিয়া কিংবা বিজয়ার ক্ষেত্রেই সত্য নয়, স্ববাসে কিংবা প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ

কখনই রমণীয় রমণী-সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হন নি।

এই রমণীয় সান্নিধ্য থাকলেই অনেক প্রবাসী সুখী হতে পারতেন।

সেই গল্পটা মনে পড়ছে।

পত্নী-তাড়িত এক ভদ্রলোক বিদেশ গিয়েছিলেন। কিছুকাল বাসের পর তিনি একদিন সকালবেলায় রাস্তায় বেরিয়েছেন। গলির মোড়ে একটা চায়ের দোকান দেখে ঐ প্রবাসী ভদ্রলোক দোকানের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঢুকে দেখেন এক মধ্যবয়সী মহিলা ময়লা ছেঁড়া হলুদমাখা শাড়ি পরে কয়লার উনুনে ভাঙা হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করে আগুন ধরাচ্ছেন। ধোঁয়ায় ঘর ক্রমশ ছেয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোককে দেখে সেই মহিলা কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'এখন চা হবে না, দেরি আছে।'

ভদ্রলোক এই শুনে চায়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে বাইরে একটু ঘোরা ফেরা করলেন। প্রায় আধঘণ্টা খানেক সময় কাটিয়ে ভদ্রলোক যখন আবার দোকানে ঢুকলেন, দোকানদার মহিলা তখন একটা নোংরা ভাঙা শিল-নোড়ায় আদা-ছেঁচছেন চায়ে দেবার জন্যে। ভদ্রলোককে দেখেই তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ভেতরে আসবেন না, বাইরে দাঁড়ান। এখনো চা হতে দেরি আছে।'

ভদ্রলোক আবার বাইরে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় অতি দুর্বল ও নড়বড়ে চেহারার এক ব্যক্তি দোকানের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তারপর তাঁকে বললেন, 'চা খাবেন তো? ভেতরে চলুন।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি?'

নবাগত বললেন, 'আমি এই দোকানের মালিক।'

পরের জিজ্ঞাসা 'ভেতরের মহিলা?'

নবাগত বললেন, 'উনি আমার স্ত্রী।'

ভদ্রলোক এবার বললেন, 'চলুন, ভেতরে গিয়ে বসছি। আপনি দয়া করে আপনার স্ত্রীকে বলুন একটা ভাঙা পেয়ালায় আধ কাপ ঠাণ্ডা চা, যার মধ্যে দুধের সর আর পিঁপড়ে ভাসছে, নিয়ে আসতে, তারপর সেই চা আমার সামনে রেখে একটা ঝাঁটা হাতে আমার সঙ্গে গল্প করতে।'

এ রকম আবদার শুনে দোকানদার বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মাথা খারাপ নয় মশায়। অনেকদিন প্রবাসে থেকে হোমসিক হয়ে পড়েছি। আজ আপনার স্ত্রীকে দেখে বাড়ির কথা, স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে।

পুনশ্চ:

গল্পটা পুরনো তবু প্রবাসী নিবন্ধে আরেকবার বলতে দোষ নেই।

কয়েকদিন আগে সানফ্রানসিসকো চিনে বাজারে অর্থাৎ এখানকার বিখ্যাত চায়না টাউনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বছর কুড়ি আগে আরেকবার এ শহরে এসেছিলাম। এবারের যাত্রা ডাউন মেমোরি লেন। পুরনো স্মৃতির সঙ্গে আধুনিক দৃশ্য মিলিয়ে দেখছিলাম। সহসা অভাবিত কাণ্ড। এক হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘবাহু ভদ্রলোক খুবই আবেগে এবং সবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, 'কিরে তুই কবে এসেছিস?' এ বয়েসে আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করার মতো লোক জগৎ সংসারে খুব বেশি নেই। খুবই চমকিত এবং আপ্লুত হয়ে ভদ্রলোকের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম। ভদ্রলোক অবশ্য ভারতীয় এবং বাঙালি। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, 'তারপর, তুই কেমন আছিস বল?' তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে যেতে লাগলেন, 'তুই তো একেবারে বদলে গেছিস। কত রোগা ছিলি, এখন এত মোটা হয়ে গেছিস। গায়ের রংটাও কেমন যেন কালো হয়ে গেছে। তোকে যে আর চেনাই যায় না ঘনশ্যাম!'

এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে আমি বললাম, 'আমি ঘনশ্যাম নই, আমার নাম তারাপদ।'

ভদ্রলোক হাহাকার করে উঠলেন, 'সে-কিরে? অমন সুন্দর নামটা, সেটাও বদলিয়ে ফেলেছিস?' সানফ্রানসিসকোর চিনে বাজারের গোলমালের মধ্যে সেই হাহাকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।
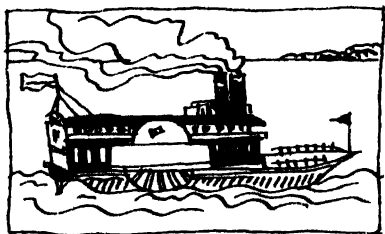
হাং সাং টাঙ্গাইল

'দেশ কোথায়?'

'টাঙ্গাইল।'

'বাড়ি কোথায়?'

'টাঙ্গাইল।'

হিন্দিতে বলা হয় মুলুক আর ঘর। যথা মুলুক দ্বারভাঙা, ঘর মধুবনী। আর

আমাদের হল দেশ আর বাড়ি। দুইই এক, দেশ যদি টাঙ্গাইল, বাড়িও টাঙ্গাইল।

দেশ বলতে যা বুঝি, বাড়ি বলতেও তাই বুঝি। তবু দেশের বাড়ি কথাটার একটা আলাদা মানে আছে। আলাদা স্বাদ গন্ধ। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

সে এক ভিন্ন কালের ভিন্ন পৃথিবীর, অনেক দূরের দেশ। দেশের বাড়িতে এখনো হয়ত যাওয়া যায়। কিন্তু সেই পৃথিবী আর কোথাও এখন নেই। ঘাসের শীতের ওপরে শিশির বিন্দুর মতো, শরৎকালের নীল আকাশের সাদা মেঘের মতো, শীতের সকালের বিষণ্ণ কুয়াশার মতো, বৌ-কথা-কও পাখির মতো সেই পৃথিবী, সেই সব দিন কবে ফুরিয়ে গেছে।

কলকাতা থেকে টানা চব্বিশ ঘন্টার পথ। অনেক সময় তার থেকে বেশি সময়ও লাগে।

সন্ধ্যেবেলায় শেয়ালদা মেইন স্টেশন থেকে সুরমা মেল। এই সুরমা মেল পদ্মার ওপারের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পেরিয়ে ঈশ্বরদি জংশন হয়ে উত্তরবঙ্গ-আসামের দিকে চলে যায়। এই ট্রেনের সঙ্গে জোড়া থাকে, ফার্স্ট ক্লাশ, সেকেন্ড ক্লাশ, ইন্টার ক্লাশ, থার্ড ক্লাশ সমেত কয়েকটি সম্পূর্ণ কোচ, তার সঙ্গে মালগাড়িও আছে। এই কোচগুলি ঈশ্বরদিতে কেটে রেখে জুড়ে দেওয়া হয় সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে।

ইঞ্জিন বদলানো, কোচ জুড়ে দেওয়া, জল তোলা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার মিটে যাওয়ার পর সেই প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঘন্টা দুয়েক বাদে রওনা হবে সিরাজগঞ্জের দিকে।

সন্ধ্যায় রওনা হয়ে, মধ্যরাতে পেরিয়ে যাওয়ার পর শেয়ালদা থেকে ব্যারাকপুর, রাণাঘাট, পোড়াদহ এবং পদ্মার দুই পারে দুই স্টেশন ভেড়ামারা এবং পাকফিতে থেমে অবশেষে ঈশ্বরদিতে এসে পৌঁছেছে। এবার গন্তব্য সিরাজগঞ্জ, ভোর-ভোর পৌঁছে যাবে সেখানে।

এ সেই সিরাজগঞ্জ স্টেশন যেখানকার রুই-কাতলা-ভারি মৃগেল যার একডাকে নাম ছিল সিরাজগঞ্জের রুই, দশকের পর দশক কলকাতার বাঙালি হেঁসেলে আমিষ যুগিয়েছে। সিরাজগঞ্জের রুইমাছ কলকাতায় এসে কাটাপোনা হয়েছে। শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বালিগঞ্জের বাঙালিবাবুরা, মাস্টারমশাই, কেরাণীবাবু, উকিল-মোক্তার এক টুকরো করে কাটাপোনার ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বংশানুক্রমে আপিস ছুটেছেন।

ঐ যে সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার সকাল বেলায় এসে সিরাজগঞ্জ পৌঁছল সেটাই সন্ধ্যাবেলা আবার ঈশ্বরদির দিকে ফিরবে। সারাদিন ফিশভ্যানে বড় বড় বাঁশের ঝাঁকায় গাদা গাদা মাছ উঠবে, পাকা রুই, চিতল-আড়, বর্ষাকালে নদীর উজ্জ্বল

শস্য ইলিশ বাঙালি রসনার প্রধান উপাদান।

সে যা হোক, এ রেলগাড়ির যাতায়াত ছিল চিরকালের মতো হারিয়ে যাওয়া রূপকথার জগৎ নিয়ে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র ভুবন থেকে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর পৃথিবী এই রেলপথের চারপাশে। ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম, সেই গ্রাম সিরাজগঞ্জের নদীর ওপারেই। এ অঞ্চলে ধলেশ্বরী যমুনার সহচরী।

রেললাইন সিরাজগঞ্জেই শেষ। সিরাজগঞ্জে তিনটি স্টেশন। সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ বাজার এবং সিরাজগঞ্জ ঘাট। প্রথম দুটি স্থায়ী স্টেশন। তৃতীয়টি নদীর মুখে, নদীর সঙ্গে এগোয় আর পিছোয়।

সিরাজগঞ্জের পর শুধু নদী আর নদী। ছোট নদী, বড় নদী, নালা, খাল, বিল। সে সব বিল হ্রদের মতো অতিকায়, কোথাও কোথাও বলা হয় হাওড়। পুরোটাই জলের এলাকা। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি দূরের কথা, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ির রাস্তাও বিরল। রিকশাও ছিল না, দুয়েকটা টুং টাং সাইকেল, ডুলি, পালকি। বড় জোর এক ঘোড়ার টমটম গাড়ি।

স্থলপথে সত্যিই তেমন কোন বাহন ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

শুধু জল আর জল। শরীরের শিরা উপশিরার মতো চারিদিকে ছড়ানো নদী, উপনদী, শাখানদী, তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দুদিকেব দুটি নদীকে যুক্ত করেছে মানুষের তৈরি খাল। সেই সব জলে নানা আকারের নানা প্রকারের নৌকা, ছোটবড় ডিঙি থেকে পানসি পর্যন্ত, বাঁশের খোলে ঢাকা ছোট ঢাকাই নৌকো থেকে প্রকাণ্ড বজরা, মানোয়ারি তরী।

ট্রেন থেকে সিরাজগঞ্জে নেমে আমাদের সময়ে অবশ্য স্টিমার ছিল। শীতে-বর্ষায় নদী পিছোতো, এগোতো। স্টিমার ঘাটও সেই সঙ্গে এগিয়ে যেত পিছিয়ে আসত। সিরাজগঞ্জ ঘাট রেলস্টেশনও তাই।

তখন কলেজে গরমের ছুটি হত মে-জুন এই দুই মাস। কলেজে পড়ার সময়ে মে মাসের প্রথমে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন ট্রেন থেকে নেমে বাক্স-বিছানা নিয়ে প্রায় একমাইল হাঁটতে হত স্টিমারে ওঠার জন্যে। আবার এর পরেই ভাদ্রের শেষে যখন পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরতাম তখন সিরাজগঞ্জের যমুনা নদী টইটম্বুর। ট্রেন থেকে নেমে অল্প দূরে স্টিমার।

আগের দিন সন্ধ্যাবেলা শেয়ালদা স্টেশন থেকে সুরমা মেলে পরের দিন সকালে সিরাজগঞ্জ ঘাটে এসে স্টিমার ধরতে হয়।

সিরাজগঞ্জ থেকে ময়মনসিংহ জেলায় দুদিকে স্টিমার যেত। একটা রেল কোম্পানির স্টিমার। অতিকায় জাহাজের আকারের। সিরাজগঞ্জ থেকে জগন্নাথগঞ্জ

পর্যন্ত স্টিমার, সেখানে গিয়ে আবার রেলগাড়ি, যার যাত্রাপথ ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা পর্যন্ত। এই স্টিমারের টিকিটের দাম রেলের টিকিটের সঙ্গেই নিয়ে নেয়া হত। গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা প্রাইভেট স্টিমার সার্ভিসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রেল কোম্পানি সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জ স্টিমার চালাত।

কোনো বিশেষ কারণ না ঘটলে আমরা ঐ জগন্নাথগঞ্জের স্টিমারে কালেভদ্রে চড়েছি। বাড়ি ও পথেও যাওয়া যেত, কিন্তু আরো একদিনের ঝামেলা। স্টিমারে ঐ জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে বিকেলে নেমে ময়মনসিংহ ট্রেনে পৌঁছতে সন্ধ্যা। সেখানে রাত্রিবাস। পরের দিন সকালে ডাক ধরে দুপুর নাগাদ টাঙ্গাইল।

আমাদের ছিল ছোট স্টিমার। জগন্নাথগঞ্জে স্টিমারের মতো তার লক্ষ্য ঢাকা-ময়মনসিংহের মতো বিখ্যাত জায়গা নয়, সে স্টিমার যাবে চারাবাড়ি, পোড়াবাড়ি। অবশ্য তার আগে পটল।

সব সময়ে সে স্টিমারে যেতাম তা নয়। অনেক সময় স্টিমার থাকত না। সে ছিল ভাড়াটে স্টিমার। কখনো বিয়ের বরযাত্রী নিয়ে চলে যেত কিংবা কোন নদীর চরের গ্রামে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট রিকুইজিশন করে নিয়ে যেত। আবার অনেক সময় সারাই হতে ঢাকা-কলকাতা পাঠানো হত।

তখন লঞ্চ চলত। বেশ বড়, ফেরি লঞ্চ। ফার্স্ট ক্লাশ আর থার্ড ক্লাশ। সেকেন্ড ক্লাশ ছিল না।

দোতলায় সারেঙ সাহেবের ঘরের সামনে একটু ঢাকা জায়গা, সেখানে কয়েকটা কাঠের চেয়ারের সঙ্গে একটা ছোট টেবিল। সেটা ফার্স্টক্লাশ। বাকি আর সব থার্ড ক্লাশ।

অনেক সময় এই লঞ্চও থাকত না। তখন গহনার নৌকো। গহনার বা গয়নার নৌকো, এর মানে কি জানি না। আসলে এটা ছিল বিশাল আকারের শক্ত, সমর্থ, ভাল করে বাঁশের ছই দেয়া যাত্রী নৌকো। প্যাসেঞ্জার বোট। আজকাল যেমন প্যাসেঞ্জার বাস তেমনি প্যাসেঞ্জার বোট।

সিরাজগঞ্জ ঘাটের বাঁক থেকে যত দূরেই তাকাই কূল-কিনারা দেখা যেত না। গহন, উত্তাল নদী। এপারে সিরাজগঞ্জ, ওপারে টাঙ্গাইল। মধ্যে অতল অকূল জল।

প্রথম স্টিমার স্টেশন পড়ত পটল। পুরনো দিনের বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দু চারজন লোক, যারা কলকাতার দিক থেকে গ্রামে আসছে তারা নামত। আবার যাদের টাঙ্গাইল শহরে মামলা-মোকদ্দমা, কেনা-কাটা আছে তারা উঠত।

এর পরে পোড়াবাড়ির ঘাট। পূর্ববঙ্গের জলপথে যারা যাতায়াত করেছেন পোড়াবাড়ি নামটি তাদের কাছে বহু পরিচিত এখানকার বিখ্যাত মিষ্টির কারণে, যা পোড়াবাড়ির চমচম নামে বিখ্যাত।

আমরা দেশের বাড়ির কাছে এসে গেছি। স্টিমার বা লঞ্চ টাঙ্গাইল পর্যন্ত যাবে না। টাঙ্গাইল শহরের পাশ দিয়ে যে ছোট নদী গেছে, লৌহজঙ্গ, তাতে জল কম, সে জলে নৌকো চলে কিন্তু স্টিমার আটকিয়ে যায়, ফেরি লঞ্চও সাবলীল ভাবে যেতে পারে না।

অবশ্য কোন কোন বছর বেশি জল হলে অথবা সিরাজগঞ্জ থেকে যদি আমরা গয়নার নৌকোয় করে আসতাম তা হলে সরাসরি টাঙ্গাইল ঘাটের পাশে মানদায়িনী সিনেমাহলের ঘাটে নামতাম।

এ রকম অবশ্য কদাচিত হয়েছে।

সাধারণত আমরা চারাবাড়ি হয়েই নামতাম। সিরাজগঞ্জের স্টিমার ওখানেই শেষ।

চারাবাড়ি ঘাটে লণ্ঠন নিয়ে অনেক লোক দাঁড়িয়ে, তারা তাদের বাড়ির লোক নিতে এসেছে।

আমাদের জন্যেও নিশ্চয়ই কেউ এসেছে।

অন্য যাত্রীদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি, হুড়োহুড়ি করে আমরা নেমে আসি ঘাটে। অতুলবাবু দাঁড়িয়ে আছেন. অতুলহরি দত্ত, আমাদের মুহুরিবাবু, ফিটফাট পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক।

অতুলবাবু সঙ্গে রাধু গাড়োয়ানের ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছেন। এক-ঘোড়ার গাড়ি, আমাদের অঞ্চলে বলে টমটম গাড়ি।

রাধু গাড়োয়ানকে তো ছোটবেলা থেকে চিনি। এই টমটম গাড়িটা, এই ঘোড়া পর্যন্ত আমার চেনা।

এবরো-খেবরো কাঁচামাটির রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি রওনা হল। বাক্স-বিছানা নিয়ে আমি গাড়িতে উঠে বসার পর অতুলবাবু ঘাট থেকে বড় এক হাঁড়ি চমচম কিনে এনেছেন। সেই হাঁড়িটা কোলে নিয়ে তিনি আমার পাশে বসেছেন।

নদীর ধারের পথ ছেড়ে আমরা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের রাস্তায় উঠলাম। সামনেই টাঙ্গাইল শহর।

অবশেষে আমরা বাড়ি এসে গেছি।

আমরা থাকব বলেই পুরনো দালানের বাইরের বারান্দায় একটা ডে-লাইট জ্বালানো হয়েছে। বারান্দায় একটা তক্তপোষ তার ওপরে শীতলপাটি, একটা ইজিচেয়ার। মা-বাবা-পিসিমা বাড়ির আর সবাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

যদি বাড়ির কথা ঠিকমতো বলতে হয়, তা হলে বলতে হবে আমাদের দুটো দেশের বাড়ি ছিল, একটা বাড়ি, আর অন্যটা বাসাবাড়ি।

আমাদের বাসাবাড়ি টাঙ্গাইল
আর বাড়ি এলাসিন। সেটাই আসল বাড়ি।
সেকালের আদালতের ভাষায়,
সাকিন এলাসিন
হাল সাকিন টাঙ্গাইল।
মনে পড়ছে, সংক্ষিপ্ত করে লেখা হত,
সাং এলাসিন
হাং সাং টাঙ্গাইল।

এলাসিনের কথা পরে কখনো বলব। আপাতত এলাসিন সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে এলাসিনে আমাদের গ্রামের বাড়ি। যোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীতে মগ, মোগলের অত্যাচারে কিংবা তারও কিছু পরে, বর্গীর হামলার ভয়ে আমরা যশোহর অঞ্চল থেকে মধ্য-বাংলার নদী-নালা দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত, সমতল এবং উর্বর কৃষি অঞ্চলে চলে আসি। আমাদের মতোই আরো অনেক পরিবার নদীর তীরে বিভিন্ন গ্রামে নতুন আস্তানা পাতে।

একটা পুরনো গ্রামের বাড়ি, সেটা হল আসল বাড়ি। আরেকটা শহরের পাকাবাড়ি।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন বাংলার মফঃস্বল শহরগুলির পত্তন হল জেলা ও মহকুমা সদর হিসেবে তখন থেকেই শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত কিছু পরিবারের দুটো করে বাড়ি। একটা গ্রামে, একটা শহরে। সে শহর অবশ্য কখনো কখনো কলকাতা নগরীও হতে পারে। শহরের বাড়িটা বাসাবাড়ি।

সে যা হোক এই মুহূর্তে আমাদের টমটম গাড়ি টাঙ্গাইল বাড়ির উঠোনে এসে থেমেছে।

বাড়ি শুদ্ধ লোক উঠোনে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আশেপাশের বাড়ি থেকেও লোকজন এসেছে। বেশ হৈ চৈ ব্যাপার।

আমাদের বাড়ি শহরের সবচেয়ে আয়তনে বড় বাড়ি। বাড়ির সামনে বিশাল পুকুর। সেটা অবশ্য আমাদের নয়। মিউনিসিপ্যালিটির। কিন্তু সেই পুকুরের জন্য বাড়িটাকে আরও বড় মনে হয়। পুকুরের ওপারের বাড়িগুলোর আলো সেই সঙ্গে জোনাকির সতত সঞ্চারমান ছায়া ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে।

আশ্বিন মাস। দুয়েকদিন পরেই পুজো। আসার সময় দেখে এসেছি, কালীবাড়িতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে কুমোরেরা দ্রুত কাজ সারছে।

বাতাসে একটু হিম হিম ভাব। নারকেল পাতার মধ্যে ঝিরি ঝিরি বাতাস। সারা বাড়ি ছেয়ে আছে ঝরা শেফালীর গন্ধে। একটু পরে রাতের দিকে চারদিক নিস্তব্ধ

হতেই গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরে পড়ার শব্দ শোনা যাবে।

বাড়ির সামনের দিকে কাছারি ঘর। আমাদের ব্যবহারজীবি বংশ, পুরুষানুক্রমে আমার বাবা পর্যন্ত সবাই উকিল। কাছারি ঘরের বারান্দায় মক্কেলরা বসে রয়েছে। তাদের দুয়েকজন হয়ত আমাদের বাড়িতে থাকবে।

একেবারে পূর্বদিকে একটা বিশালাকার কাঠের দোতলা ঘর। আগে মুহুরিবাবুরা এবং অতিথিরা থাকতেন, এখন সেটায় একটা পাঠশালা বসে। সেই পাঠশালায় একদা আমিও পড়েছি।

সামনে আমাদের পুজোর দালান। ঘরের পর ঘর। থাম লাগানো আট হাত চওড়া টানা বারান্দা পুরো দালানটাকে ঘিরে। আমাদের ভাষায় বাইরের বারান্দা আর ভিতরের বারান্দা। দুই বারান্দায় একসঙ্গে আড়াইশো লোক পাতা পেড়ে খেতে পারে।

বাইরের উঠোন থেকে লম্বা, টানা সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দায়। ভিতরের দিকে গোল সিঁড়ি। একটু সামনে পর পর তিনটে টিনের ঘর।

বড় ঘরটায় থাকতেন আমার পাগল কাকা, তারপর সমান আকারের দুটো দোচালা টিনের ঘর। একটা হবিষ্যি ঘর, একটা রান্না ঘর।

হবিষ্যি ঘর, রান্নাঘরের পিছনে পুরনো ফুলবাগান। জবা, শেফালী, রঙ্গন, টগর, কাঠচাঁপা, অযত্নের গোলাপ।

বাড়ির চারপাশে কত রকমের গাছ। আম, কাঁঠাল, সুপুরি, নারকেল তো আছেই কামরাঙ্গা, চালতে, এমনকি সেই আমলের পক্ষে অস্বাভাবিক দুটি ইউক্যালিপটাস গাছ।

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে পুরো বাড়িটা একবার পাক দিয়ে আসি। ততক্ষণে ডে-লাইটটা বাইরের বারান্দা থেকে রান্নাঘরের বারান্দায় নিয়ে আসা হয়েছে।

একটু পরে পুকুরের ঘাটে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপর কাপড়-চোপর ছেড়ে গোলবারান্দায় গিয়ে ভিতরের উঠোনে নেমে এসে দেখি চারদিক ম-ম করছে গরম ভাতের গন্ধে। একটু পরে মাছ-ভাজার গন্ধও পাওয়া গেল।

ও পাশে ফুলবাগানের পাশে তুলসীমঞ্চে সলতে ফুরিয়ে গিয়ে প্রদীপের বুকটা পুড়ে যাচ্ছিলো। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা কাঠি দিয়ে প্রদীপের সলতে উসকিয়ে দিলাম।

এরই মধ্যে রান্নাঘরের বারান্দায় সারি সারি কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পাতা হয়ে গেছে। এখনই সবাইকে খেতে ডাকা হবে। দু বেলা ভাত খাওয়া হয়নি। আমি ডাক পাড়ার আগেই বারান্দায় গিয়ে পিঁড়ির ওপরে বসে পড়ি।

একটা টিকটিকি দালানের বারান্দা থেকে আমাকে সায় দেয়, 'ঠিক, ঠিক, ঠিক।'

গাধা সিরিজ (এক)

সেদিন কে যেন আমাকে বললেন, 'আপনি কখনো গাধাকে নিয়ে কিছু লেখেন নি?'

সদ্য সমাপ্ত মহামতি ক্লিন্টনের ভারতসফর নিয়ে গালগল্প হচ্ছিলো ক্লাবের বারান্দায়। আগ্রার গাধারা নাকি ক্লিন্টন সাহেবের তাজমহল দর্শনের সময় স্থানীয় প্রশাসনকে খুব হয়রানি করেছে।

ক্লিন্টন সফরের আগে অন্যান্য শহরের মতো আগ্রাতেও ভিখিরি, ভবঘুরে, অটো, ঝুপড়ি ইত্যাদি উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এই সঙ্গে শহরের সব গাধাও আগ্রার বাইরে বের করে দেওয়া হয়।

যারাই আগ্রায় গেছেন, লক্ষ্য করেছেন আগ্রার রাস্তায়-রাস্তায় গলিতে-গলিতে গাধা। গাধার জন্যে ট্রাফিক আটকিয়ে যাচ্ছে, বাজারে ঢোকা যাচ্ছে না। এমন কি অফিস-কাছারির ঘরে বারান্দায় গাধা গট গট করে হাঁটছে।

ক্লিন্টন সফরের সময় সাময়িক ভাবে সেই গাধাদের বহিস্কার করা হয়েছিল আগ্রা নগরী থেকে। কিন্তু প্রশাসনের শুধু হয়রানি হয়েছে, কাজের কাজ কিছু হয় নি। শহর থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল গাধাকুলকে। কিন্তু যেদিন ক্লিন্টন তাজ দর্শনে আগ্রায় এলেন, সেদিনই দেখা গেল শহরে ঢোকার বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে কিলবিল করে ফিরে আসছে বিতাড়িত গর্দভেরা। এত গাধা দেখে মাননীয় মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিচলিত বোধ করেছিলেন কিনা, তা অবশ্য বলা কঠিন।

তা, ক্লাবের নৈশ আড্ডায় বারান্দায় বসে যখন গাধা নিয়ে এই সব আলোচনা হচ্ছিলো, আমাকে আচমকা একজন স্মরণ করিয়ে দিলেন যে গাধা নিয়ে আমি কখনও নাকি কিছু লিখিনি।

এ অনুযোগ অবশ্য সত্যি নয়। গাধা সম্পর্কে ইতস্তত আমি বেশ কয়েকবার লিখেছি। এমন কি 'বক্রবাহন' নামক একটি গাধার গল্পও একদা লিখেছিলাম। তবে মোট অর্থে গাধা বা গর্দভ শীর্ষক কোনও রচনা আমি এর আগে লিখিনি।

কিন্তু নৈশকালীন এ ধরনের তরল আড্ডায় এ সব সাফাই মোটেই গ্রাহ্য হয়

না। তাই আমি রহস্য করে বললাম, 'গাধা নিয়ে কিছু লেখা তো কঠিন ব্যাপার নয়। একটা আয়না সামনে নিয়ে বসলে আমি তরতর করে লিখে যেতে পারব।'

ব্যাপারটা সেদিন ওখানেই মিটে গেল, কিন্তু গাধার ভাবনা আমার মাথায় ঢুকে গেল। গাধা বিষয়ে আমি কিছু কম জানি না। ভেবে চিন্তে চেষ্টা করলে অনায়াশে একগ্রন্থ 'গাধা সিরিজ' লিখে ফেলতে পারি।

প্রথমেই সেই বহু পরিচিত গোলমেলে গল্পটি দিয়ে শুরু করি।

স্বামী-স্ত্রী এবং আট-দশ বছরের একটি ছেলে, এই সুখী পরিবারটি বিহারের একটি স্বাস্থ্যকর শহরে বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে গেছে। দুঃখের বিষয়, এই প্রবাসেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি চলছে। আজ বিকেলে রীতিমত দাম্পত্য কলহ হয়ে গেছে। স্ত্রী হোটেলের ঘর থেকে বেরোন নি। স্বামী ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

সামনের একটা সবুজ ঘাসের মাঠ, চারদিক গাছ দিয়ে ঘেরা। ভদ্রলোক ছেলেকে নিয়ে মাঠের পাশে দাঁড়ালেন। মা-বাবার নৈমিত্তিক কলহে উদাসীন ছেলে বকবক করে কথা বলে যাচ্ছে, প্রশ্ন করছে।

সামনের মাঠে একটা গাধা চরছে। কলকাতার ছেলে, আগে গাধা দেখে নি, সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, এটা কি?' বাবা বললেন, 'এটা একটা গাধা।' একটু পরে আর একটা গাধা এসে জুটল, ছেলের প্রশ্নে বাবা বললেন, 'এটা গাধার বৌ।'

এ কথা শুনে ছেলের সরল প্রশ্ন, 'বাবা, গাধারা বিয়ে করে?' বাবা বিরসবদনে বললেন, 'হ্যাঁ। গাধারাই শুধু বিয়ে করে।'
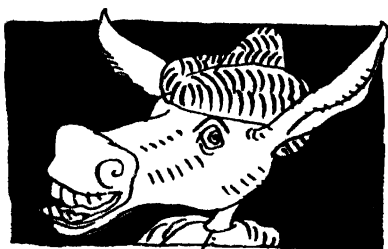
গাধা সিরিজ (দুই)

আপনারা কেউ কি কখনও লক্ষ্য করেছেন, প্রত্যেকটি গাধা একরকম দেখতে। তাদের চেহারার মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য নেই। সেই একই রকম ড্যাবডেবে চোখ, লটপটে কান, এমন কি গায়ের লোমের রঙ পর্যন্ত হুবহু এক রকম।

আপনি হয়ত একটু ভেবে নিয়ে বলবেন, 'কিন্তু সে তো বাঘ-সিংহ, শেয়াল সব জন্তুই যে যার মতো একই চেহারার।'

কিন্তু সেগুলো তো বুনো জন্তু। মানুষের পোষা জন্তু নয়। গৃহপালিত জন্তু কুকুর-বেড়াল, গরু-ঘোড়া এমনকি গিনিপিগ পর্যন্ত, একেকটা একক রকম দেখতে। কোনোটা কালো, কোনোটা সাদা, কোনোটা সাদা-কালো, কোনোটা পাটকিলে। মানুষ তার আপন মনের মাধুরী মিলিয়ে জীবনে জীবন যোগ করে এই বৈচিত্র্য এনেছে। নানা জাতের, নানা রঙের, নানা আকারের একই জন্তুর সংমিশ্রণে এই সব জন্তু পরিণতি লাভ করেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে গাধাও তো গৃহপালিত জন্তু। সেই হিতোপদেশের আমল থেকে আমরা গাধার সঙ্গে পরিচিত। গাধার রকম ফের হল না কেন? কি জানি।

সেই পৌরাণিক কাহিনী মনে আছে।

একদা এক নির্মেঘ, নির্মল প্রভাতে রাজামশাই ঘোড়ার পরে, লোক লস্কর নিয়ে মৃগয়া করতে যাচ্ছেন। যাওয়ার পথে রাজবাড়ির ধোপার সঙ্গে রাজার দেখা।

ধোপা বলল, 'রাজামশাই আজ শিকারে যাচ্ছেন?'

ঘোড়া থামিয়ে রাজা বললেন, 'কেন?'

ধোপা বলল, 'সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি আসছে।'

রাজামশাই অবাক হলেন। অবাক হওয়ারই কথা। বসন্ত কালের ঝকঝকে সকাল, পরিষ্কার নীল আকাশ। তদুপরি নানারকম আঁকিবুকি, হিসেব করে রাজজ্যোতিষী স্বয়ং আজকের দিনটি মৃগয়ার জন্যে প্রকৃষ্ট বলে নির্ণয় করেছেন।

সুতরাং রজকের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে রাজা মৃগয়ায় গেলেন।

অতঃপর যা ঘটল সেটা অবিশ্বাস্য। বনের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে শুরু হল অসময়ের কালবোশেখি। সঙ্গীসাথী, লোক লস্কর কে কোথায় ছিটকিয়ে গেল। জঙ্গলের পথে দিশাহীন হয়ে রাজামশাই প্রবল বৃষ্টিতে ঘোড়া ফিরিয়ে ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে রাজপ্রাসাদে ফিরলেন, তখন তাঁর সর্বাঙ্গ সিক্ত, উষ্ণীষ থেকে চোগা-চাপকান পাদুকা পর্যন্ত চপচপে ভেজা।

প্রাসাদে ফিরেই রাজামশাই প্রথম যে কাজ করলেন সেটা হল, প্রবীণ রাজজ্যোতিষীকে কোতল করা। দ্বিতীয় কাজটি হল, ধোপাকে রাজজ্যোতিষী পদে বহাল করা।

কিন্তু ধোপা বলল, 'আমি কি জ্যোতিষী হব? আমি জ্যোতিষের কিছুই জানি না।'

রাজা বললেন, 'তা হলে? কি করে বললে যে ঝড়বৃষ্টি আসছে?'

ধোপা বলল, 'আমার গাধাটার কান ঝড়বৃষ্টি আসার আগেই খাড়া হয়ে যায়। সেই দেখে আমি টের পাই।'

রাজা বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা। এই গাধাই আমার রাজজ্যোতিষী হবে।'

এবং এই আরম্ভ। এরপর থেকে গাধারাই, শুধু গাধারাই উচ্চরাজপদে নিযুক্ত হচ্ছে।

গাধা সিরিজ (তিন)

গাধার কথা সহজে ফুরোতে চায় না। প্রথমে ভেবেছিলাম, কি লিখব। তারপর লিখতে লিখতে এখন দেখছি, অনেক কথাই লেখার আছে।

তবে গাধা নিয়ে বাড়াবাড়ি করব না। গাধা সিরিজের এটাই শেষ কিন্তু। পরে আবার কখনো না হয় লেখা যাবে।

গাধা নিয়ে আমার একটা তিক্ত বাল্যস্মৃতি আছে।

তখন আমি স্কুলের মাঝারি ক্লাসের ছাত্র, সেভেন এইট হবে। আমাদের সংস্কৃতের সেকেণ্ড পণ্ডিত ছিলেন অত্যন্ত রগচটা প্রকৃতির ছেলে, রীতিমত মারকুটে স্বভাব। একদিন 'পঞ্চতন্ত্র' পড়াতে পড়াতেই বোধহয় তিনি প্রশ্ন করলেন, 'রাসভ মানে কি?'

ক্লাসে কেউই পারল না মানেটা বলতে। তখন পণ্ডিতমশাই আদেশ করলেন, 'এই শ্রেণীকক্ষে যারা রাসভ রয়েছ, সবাই উঠে দাঁড়াও।'

কেউই উঠে দাঁড়াল না। আমার কি যে খেয়াল হল আমি প্রায় কিছু না বুঝে একাই উঠে দাঁড়ালাম। তখন কি আর জানতাম যে রাসভ মানে গাধা, তা হলে কি উঠে দাঁড়াই।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'তুমি দাঁড়ালে যে, তুমি কি রাসভ?'

আমি বিনীতভাবে বললাম, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাই দাঁড়ালাম।' পণ্ডিতমশাই রেগে গেলেন, 'তা হলে এই শ্রেণীকক্ষে তুমি আর আমি দুজনে রাসভ। আমাদের চার চরণ কোথায়?'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'স্যার আমার দুই চরণ আর আপনার দুই চরণ, এই নিয়ে চার চরণ।'

এবার পণ্ডিতমশাই খেপে গেলেন, তালপাতার হাত পাখার ডাঁট দিয়ে আমাকে মারতে লাগলেন। অর্ধেক গর্দভত্বের রাগে তিনি দিশেহারা হয়ে পেটালেন।

গাধামির জন্যে জীবনে বহুবার বহুরকম মার খেয়েছি কিন্তু অমন পিটুনি আর খাইনি।

অবশেষে একটি সুপ্রাচীন আশাব্যঞ্জক কাহিনী দিয়ে গাধা বৃত্তান্তের ইতি টানছি। এক ধোপা তার গাধাকে কারণে অকারণে প্রচণ্ড পেটাত। গাধার বন্ধু ছিল প্রতিবেশীদের এক বলদ। সেই বলদ একদিন গাধাকে বলল, 'তুমি কি জন্যে পড়ে পড়ে মার খাও, পালিয়ে গেলেই পারো।'

গাধা বলল, 'পালাতে চাইলেই তো পালাতে পারি, কিন্তু একটা আশায় বুক বেঁধে এখানে আছি।'

গাধার সেই আশাব্যঞ্জক ব্যাপারটা এই রকম। ধোপার একটা সুন্দরী মেয়ে আছে। ধোপা তাকে পাঠশালায় ভর্তি করেছে। কিন্তু সেই মেয়ের লেখাপড়ায় মোটেই মন নেই, সারাদিন খেলে বেড়ায়। গাধার মতোই মেয়েকেও পেটায়, আর বলে, 'লেখাপড়া না করলে তোকে ঐ গাধার সঙ্গে বিয়ে দেব।' ব্যাপারটা বিবৃত করে, গলা নামিয়ে গাধা বন্ধু বলদকে বলল, 'মেয়েটার একদম লেখাপড়ায় মন নেই। আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল বলে।'

গাধা সিরিজ এখানে শেষ। কিন্তু গাধারা ছিল, আছে এবং থাকবে।

নিঃসংশয়

নিঃসংশয় মানে সংশয়হীন।

কোনো বিষয় বা ব্যাপারে আমাদের মনে যদি কোনো সংশয়, সন্দেহ, চিন্তা বা ধন্দ না থাকে তবেই সে ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি।

অকূল মহাসমুদ্রে নাবিকেরা ধ্রুবতারা দেখে উত্তর দিক নির্ণয় করে। তখনো সংশয় থাকে, যে তারাটিকে নির্ভর করা হচ্ছে সেটি সত্যিই ধ্রুবতারা কি না।

এ রকম আরো বহু উদাহরণ দেখা যেতে পারে। সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া কোনো ব্যাপারেই সম্ভব নয়। ব্যতিক্রম হল মৃত্যু। অবধারিত। যে কোনো মানুষ নিঃসংশয় হতে পারে যে সে একদিন না একদিন মারা যাবেই।

বুঝতে পারছি, ভুল হচ্ছে। এই রম্য রচনায় মৃত্যু ইত্যাদিকে ডেকে আনা উচিত হচ্ছে না। তবে তাঁরা অন্য অনেক ব্যাপারেই নিঃসংশয়, তাঁরা ভাবেন দুইয়ে দুইয়ে সব সময়ই চার হয়, সেটাও ঠিক নয়। স্বয়ং শিবরাম চক্রবর্তী বলে গেছেন, 'দুইয়ে দুইয়ে অনেক সময় চার হয়, সেটাও ঠিক নয়, অনেক সময় দুধও হয়'। শিবরাম অবশ্য দুধ দোয়ানোর কথা বুঝিয়েছিলেন। এত বুদ্ধির ব্যাপার নয়। আমরা এরপর একটু মোটা দাগের গল্পে যাচ্ছি। এই কয়েকদিন আগে আমাদের ক্লাবে এক সবজান্তা ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদের টেবিলে এসে বসলেন এবং তারপর বিনা প্ররোচনায় বললেন, 'দেখুন, মশায়রা আমি একটা বিলিতি বই পড়ে নিঃসংশয় হয়েছি যে ব্যাচেলর বা অবিবাহিত পুরুষদের তুলনায়, বিবাহিতেরা দীর্ঘজীবী হয়।'

আমাদের টেবিলে এক প্রবীণ ডাক্তারবাবু বসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ভদ্রলোক যা বললেন, তা কি সত্যি?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'এক অর্থে সত্যি নয়। আবার আরেক অর্থে সত্যি তো বটেই।'

আমি বললাম, 'কি সব ভণিতা করছেন, যদি জানেন তো তা হলে সত্যি কথাটা একটু তাড়াতাড়ি গুছিয়ে বলুন।'

প্রথম ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, 'ডাক্তারবাবু আবার কি বলবেন। আমি যা বলেছি, সেটা সাহেবরা গবেষণা করে জেনেছে।'

ডাক্তারবাবু আবার বললেন, 'দেখুন ব্যাপারটা গোলমেলে। বিবাহিত-অবিবাহিত দু দলই প্রায় সমানে-সমানে বাঁচেন। তবে স্বভাবতই বিবাহিত ব্যক্তিরা যতদিন বাঁচেন মনে করেন, তার চেয়ে অনেক বেশি দিন বেঁচে আছেন। অবিবাহিতদের অবশ্য এসব সংশয় নেই।

নানা রকম গড়িমসির পর অবশেষে একটি সংশয়হীন কাহিনী বলি।

বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা সেরে ফিরে এসেছে মাধব ও মাধবী। এবার তাদের নতুন সংসার জীবনের পালা।

পালার শুরুতেই মাধব ঠিক করল দুয়েকটা অপ্রিয় সত্যকথা মাধবীকে বলে রাখা প্রয়োজন। তাই সে মাধবীকে বলল, 'দ্যাখো, মাধবী এই কয়েকদিন আমি তোমাকে ভাল করে দেখলাম। লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটা দোষত্রুটি পেয়েছি, সেগুলো

আমি তোমাকে বলছি। চেষ্টা করো, সেগুলো সংশোধন.....

মাধবকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মাধবী নিঃসংশয় কণ্ঠে বলল, 'দ্যাখো আমার কি কি ত্রুটি সে আমি ভালই জানি। আর সে জন্যেই তোমার চেয়ে ভাল পাত্র আমি জোগাড় করতে পারলাম না।'

পত্রের উত্তর

কল্যাণীয়াসু,

পরিচারিকা বাহিত তোমার নিদারুণ পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি পাঠ করে ফেলেছি।

এত রাগ? আমার লেখার ওপরে তোমার এত রাগ?

আমি তোমাকে কখনও দেখিনি। তবু তোমার ক্রোধান্বিতা মুখশ্রী কল্পনা করার চেষ্টা করছি। তোমার তো অভিযোগ একটাই আমি কেন পুরনো দিনের ভাঙা রেকর্ডের মতো একই কথা বারবার বলে যাচ্ছি, একই গল্প শতবার শোনাচ্ছি।

কিন্তু ঠাকুরাণি, আমার যদি অনুমান ভুল না হয়, তুমি মোড়ের তিনতলা বাড়ির নতুন বৌ। তুমি যে গত চার মাস ধরে রাতদিন সকাল সন্ধ্যা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'আসছে শতাব্দীতে, আসব ফিরে তোমার খবর নিতে' বাজিয়ে বাজিয়ে পাড়ার লোকের কানের পোকা বার করে দিয়েছ, তার বেলা? নেতারা যে বছরের পর বছর বলে যাচ্ছেন, 'ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ', সেই একই কথা। তার বেলা?

এই প্রশ্নে আমি পরে ফিরে আসব। তার আগে তোমাকে খুশি করার জন্যে এবার শুধু গল্প আর গল্প।

কয়েকটি পুরনো গল্প যার মজা এখনো ফুরিয়ে যায় নি, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমারও সুবিধে, বানিয়ে বানিয়ে বাজে গল্প লেখার হাত থেকে ক্ষণিক অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

তা, সেই ভয়াবহ গল্পটা দিয়েই শুরু করি। কোনও এক অফিসে, যেমন হয়, হয়ে থাকে, এক সহকর্মী আর এক সহকর্মিনীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া, বাদানুবাদ।

এরকম প্রায় প্রতিদিনই চলে। একদিন সেই ঝগড়া তুঙ্গে উঠল।

বলা বাহুল্য, কি নিয়ে ঝগড়া তা আমরা কেউ জানি না। তোমরা কেউ অনুমান করতে যেও না।

সেই উচ্চকণ্ঠে কলহের সর্বশেষে শোনা গিয়েছিল, 'আমি যদি তোমার স্ত্রী হতাম, আমি তোমার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতাম।' ভদ্রমহিলা তাঁর সহকর্মীকে চিৎকার করে একথা বলেছিলেন।

এরকম ভয়-দেখানোয় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'আমি যদি তোমার স্বামী হতাম আমি সেই বিষ খেতাম।'

কথাটা গোলমেলে। অর্থাৎ, তোমার মতো স্ত্রীর স্বামী হয়ে বেঁচে থাকার থেকে বিষ খেয়ে মরা ভাল। ভয়াবহ গোলমেলে কথা। অবশ্য গোলমেলে না হলেই মস্করা জমে না।

আরেকটি গোলমেলে কথা মনে পড়ছে।

এক নির্বোধ প্রেমিক গদগদ কণ্ঠে তার ভালবাসার প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওগো, একবার মুখ ফুটে বল না, আমি কি তোমার যোগ্য?'

সেই প্রেমিকা বলেছিল, 'না। সত্যি কথাটা হল তুমি আমার যোগ্য মোটেই নও।' তারপর, একটু পরে সান্ত্বনা দেওয়ার গলায় বলল, 'তবে তুমি অন্য যে কোনও মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট যোগ্য।'

পুনশ্চ :

কল্যাণীয়াসু,

কোপান্বিতা হওয়ার পথে সামান্য মশলা এবারও এগিয়ে দিলাম। দেখি তোমার প্রতিক্রিয়া কি হয়।

আমি বলি কি, রাগ করে লাভ কি? তার চেয়ে হাসো, আরো হাসো।

ইতি

তোমার অপ্রিয় লেখক।

আবার উত্তর

আবার কল্যাণীয়াসু,

পত্রের আড়ালে আরো দুটো গল্প অবশ্যই এবার বলব। তবে তার আগে একটু নিজের সাফাই গাইছি।

দার্শনিকেরা বলেন, একই নদীর জলে দু'বার ডুব দেয়া যায় না। একটি ডুবের থেকে পরের ডুবের মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে যায় নদীস্রোতে, পিছনের জল এগিয়ে আসে। দ্বিতীয়বার ডুবের সময় একই জল থাকে না।

ঠিক সেই রকমই একই গল্প দুবার বলা যায় না। একই রসিকতা দুবার করা যায় না। সময় এবং পরিবেশ অনুযায়ী, রচনার সময় লেখকের মনোভাব অনুযায়ী কাহিনী বদলিয়ে যায়। বদলিয়ে যায় নাম-ধাম, স্থান, কাল, চরিত্রের লিঙ্গ ও বয়েস।

তবে সব কাহিনীর খোল-নলচে কিন্তু আগাগোড়া বদলিয়ে দেয়া যায় না।

এই পুরনো গল্পটা ধরা যাক। সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে নতুন বৌ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে! স্বামী অফিস থেকে ফিরে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে বৌয়ের গান শুনে বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে!

পাড়ার একটি ছেলে বলল, 'দাদা, বাড়ি যাবেন না?' দাদা বললেন, 'তোমার বৌদির গানটা শেষ হোক।'

'বৌদির গান গাওয়ার সময় ডিস্টার্ব করার মানা আছে বুঝি?' ছেলেটির সরল প্রশ্ন।

দাদা বললেন, 'আরে তা নয়। বৌদির ওই নাকি সুরে গান শুনছো না? আমি বাড়ির মধ্যে থাকলে তোমরাই বলবে, দাদা বৌদিকে পেটাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বধূ নির্যাতনের মামলায় পুলিশ এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

এই গল্পের রং বদল করা খুব কঠিন। পাত্রকে পাত্রীর ভূমিকায় এবং পাত্রীকে পাত্রের ভূমিকায় দেখালে গল্পের দফারফা হয়ে যাবে।

বিপরীতক্রমে এই গল্পটি দেখুন। এক সুবেশ ভদ্রলোককে তাঁর বন্ধু বলেছিলেন,

'ভাই তোমার দরজির ঠিকানাটা আমাকে একটু দেবে?' দ্বিধাগ্রস্ত সুবেশ ভদ্রলোক বললেন, 'তা দিতে পারি শুধু এক শর্তে, আমার ঠিকানা তুমি ওকে দেবে না।'

বলা বাহুল্য, দরজির কাছে ভদ্রলোকের প্রচুর ধার। দরজিকে গয়নার দোকান করে, সুবেশ ভদ্রলোককে সালংকারা মহিলা করে এ-গল্প ওলট পালট করা যায়। যেমন আরেকটা গল্প।

বনমালী তার দয়িতাকে বলেছিল, 'দ্যাখো, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা তুমি কিন্তু গোপন রেখো। খুব বেশি চাউর করতে যেয়ো না।'

দয়িতা বলল, 'আমি কাউকেই কিছু বলব না। শুধু আমার বন্ধু মালতীকে বলব।'

বনমালী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আবার মালতী কেন?'

দয়িতা বলল, 'মালতী বলেছিল, বিশ্বসংসারে এমন কোনো উল্লু নেই যে তোকে বিয়ে করবে। এবার বিয়ের খবরটা দিয়ে মালতীর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব।'

এ গল্প কিন্তু যত ইচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা যায়।

সংশয়

অভিধান বলছে, সন্দেহ অর্থ সংশয়। কিন্তু সত্যিই কি সন্দেহ আর সংশয় এক জিনিস। আমাদের সংশয় থাকে পরীক্ষায় পাশ করব কিনা, এবং সন্দেহ হয় আপনি সত্যিই পরীক্ষায় পাশ করেছেন কিনা।

সন্দেহবাতিক বলে একটা জটিল মনস্তাত্ত্বিক রোগ আছে। এই রোগ দাম্পত্য সম্পর্কীয়। স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করেন। দুপুরবেলা অফিস পালিয়ে বাড়িতে এসে দেখেন স্ত্রী কারো সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করছেন কি না। দুপুর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে দেখেন স্ত্রী বিছানায় না অন্য কোথায়।

স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করেন। স্বামী অফিস থেকে ফিরলে কোট জামার পকেট তন্ন তন্ন করে খোঁজেন কোনো মহিলা তেল পাওয়া যায় কি না। যখন পান না তখন স্বামীকে বলেন, 'ছি ছি তোমার রুচি এত নেমে গেছে, একটা টেকো বুড়ির সঙ্গে প্রেম করছো।'

এ সব ব্যাপার হাস্যকর। কিন্তু ভুক্তভোগী স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষে মর্মান্তিক।

সে যা হোক, রহস্যকাহিনীকে মর্মান্তিক করার ইচ্ছে নেই, বরং সন্দেহজনক কাহিনীতে হাসির উপাদান খোঁজ করব।

বিশ্বাসযোগ্য নয় বরং রীতিমত সন্দেহজনক এ রকম প্রত্যেকটি কাহিনী উদাহরণস্বরূপ দেখা যেতে পারে।

এক

বাংলা চলচ্চিত্রের এক খ্যাতনামা মধ্যবয়সী অভিনেতা, যিনি যথার্থ মদ্যপ ও লম্পট। একদা এক সুন্দরী, নবীনা অভিনেত্রীর পদপ্রান্তে বসে কাতরোক্তি করেছিলেন, 'তুমি আমাকে অবহেলা কোরো না। আমি তাহলে আত্মহত্যা করব।'

অনেকবার এই কথা শোনার পর সুন্দরী বললেন, 'বারবার এই একই কথা বলছো। কই করে তো দেখাচ্ছ না।'

দুই

টিভি বা দূরদর্শন জিনিসটা বর্ধমানের এক ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল।

তিনি অনেক ভেবেচিন্তে তারপর বললেন, 'ধরে নিন একটা খুব লম্বা সাপ, সাপের লেজটা কলকাতায়, মাথাটা বর্ধমানে। সেই সাপের লেজটা কলকাতায় কেউ মাড়িয়ে দিল আর সাপটা বর্ধমানের একটা লোককে ছোবল মারল। এই হল দূরদর্শন।'

'কিংবা ধরা যাক, টিভি একটা অবিশ্বাস্য লম্বা কুকুর। যার মুখটা কলকাতায় আর লেজটা বর্ধমানে, কলকাতায় কিছু খেতে দিলেই বর্ধমানে লেজ নাড়ে।'

বলা বাহুল্য. এ সব গল্প যতটা সন্দেহজনক তার চেয়ে ঢের বেশি এলোমেলো।

অবশেষে একটা প্রকৃত সন্দেহজনক কাহিনী। এক ভদ্রলোক একটা দোকান থেকে হাতির দাঁতের একটি কৌটো কিনেছিলেন, বহুমূল্যে। বলা বাহুল্য, দোকানদার যথারীতি গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে এটা খাঁটি হাতির দাঁত, আসল আইভরি।

ঘটনাচক্রে ঐ দামি কৌটোটি মেঝের উপর পড়ে ভেঙে যায়, একেবারে চুরমার। তখন ধরা পড়ে যায় যে আইভরির নয়, কৌটোটি নকল হাতির দাঁতের।

ক্রেতা ছাড়বেন কেন? তিনি গিয়ে বিক্রেতাকে ধরলেন, 'এটা কি হল?'

'আমার কিছু করার নেই স্যার' বিক্রেতা বললেন, 'ঐ হাতিটার বাঁধানো দাঁত ছিল, সেটা আমি কি করে জানবো।'
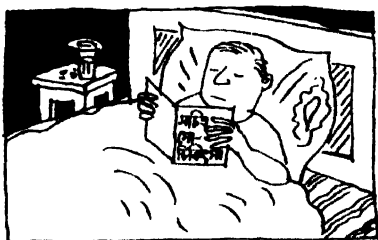
জানোয়ার

সন্দেহজনক মানুষজন নিয়ে তো অনেক কথাই বলা হল। অবশেষে এবারের প্রসঙ্গ জানোয়ার।

জানোয়ার বিষয়েও, প্রথমেই স্মরণ করছি কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি বিখ্যাত উক্তি, 'আমার বিশ্বাস জীবজন্তুর সঙ্গে আমি অনায়াসে থাকতে পারব, বসবাস করতে পারব। জীবজন্তুরা কেমন নির্লিপ্ত অথচ স্বাধীনচেতা। আমি অনেক সময়েই তাদের লক্ষ্য করি। জানোয়ার কখন কি হবে, হতে পারে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। রাতে না ঘুমিয়ে, অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুশ্চিন্তা করে না। কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ করে না। তারা সদাসন্তুষ্ট। তারা কখনো কিছু সঞ্চয় করে না, কোনো কিছু নেই বলে তারা দুঃখিত নয়।'

আমার নিজের জানোয়ার সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে। এ জীবনে অসংখ্য কুকুর-বিড়াল আমি পুষেছি, এমনকি ছেলেবেলায় দেশের বাড়িতে আমাদের গরু-ছাগলও ছিল। একবার একটা ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া, তার পিঠে ওঠার চেষ্টা করায়, আমাকে কামড়ে দিয়েছিল। সে গল্প অন্যত্র লিখেছি, সেই কামড়ের স্মৃতি, ঘোড়ার চৌকো দাঁতের চিহ্ন আজও আমার ঘাড়ে বহন করছি।

গরু সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আছে।

একবার কি-একটা অসুখে কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। তখন আমার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, ভাত খাওয়ার পয়সাই নেই, ওষুধ-চিকিৎসার ব্যয় সংগ্রহ করা অসম্ভব।

সেই সময়ে এক সুরসিক বন্ধু আমাকে দেখতে আসেন। কালীঘাট মন্দিরের সামনের ফুটপাথ থেকে তিনি আমার জন্যে একটা বই কিনে এনেছিলেন। বইটির নাম, 'সচিত্র গো-চিকিৎসা'।

বইটি আমাকে দিয়ে বন্ধু বললেন, 'বইটি ভাল করে পড়। নিয়ে এলাম, যাতে এখন থেকে তুমি তোমার নিজের চিকিৎসা নিজেই করতে পারো।'

অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তিনি আমাকে গরুর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

সে যাক। গরু-ঘোড়ার পরে এবার একটু কুকুর-বিড়ালের কথা বলি।

কুকুরের গল্পটা কেমন যেন গোলমেলে।

এক ভদ্রলোক কুকুরের ডাক্তারের কাছে গেছেন তাঁর বুড়ো শিকারি কুকুর নিয়ে। কুকুরটার এমনিতে অসুখ-বিসুখ হয়নি। তবে সব সময়ে শুধু ঝিমোয়। কোনো উৎসাহ নেই, তেজ নেই।

ডাক্তার, এই কথা শুনে কুকুরকে এক চামচে ওষুধ খাইয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা বিদ্যুৎ বেগে ছুট দিল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ওষুধের দাম কত?'

ডাক্তার বললেন, 'একশো টাকা।'

ভদ্রলোক তিনশো টাকা ডাক্তারকে দিয়ে বললেন, 'একশো টাকা কুকুরের জন্যে, আর দু'চামচ আমাকে দিন, আমাকে তো এখন ছুটে গিয়ে কুকুরকে ধরতে হবে।'

সর্বশেষে বিড়ালের গল্পটা খুব ছোট এবং মধুর।

একটি বিড়াল নাম বলতে পারে।

বিড়ালটির নাম 'মিউ'। নাম জিজ্ঞাসা করলেই বলে, 'মিউ।'

দাম্পত্য

নতুন যুগের অভিধানকারেরা হ্রস্ব-দীর্ঘ নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামালেন, অবশেষে দীর্ঘকে প্রায় বিসর্জন দিলেন।

আমরা লিখতাম হাতী, বাড়ী, বিবাদী। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রও তাই লিখতেন। এমনকি পরের যুগের কল্লোলের লেখকরা, এবং তারও পরের লেখকেরা, এই অতি নগণ্য পত্রকার পর্যন্ত মনের সুখে দীর্ঘ-ঈকার ব্যবহার করতাম।

কিন্তু এখন আর তা চলছে না। এখন হাতী নয় হাতি, বিবাদী নয় বিবাদি!

এই রকম একটি শব্দ ছিল দম্পতী, সে কিন্তু অনেক আগেই দম্পতি হয়ে

গেছে। অবশ্য মধ্যে দম্পতি-দম্পতী দুই-ই চলত।

কে যেন বলেছিলেন দাম্পত্য প্রেম গভীর হলে দম্পতী, না হলে দম্পতি।

আমরা এই আলোচনায় ওই দ্বিতীয় দফার মানে যাদের দাম্পত্য সম্পর্ক তেমন ঘন নয় বরং কিঞ্চিৎ খটমটে তাদের প্রসঙ্গে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গ নম্বর এক, একটি বিপজ্জনক কাহিনী।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাংঘাতিক ধরনের দাম্পত্য কলহ চলছে, বেশ কিছু দিন হল। এদিকে এদের বিবাহবার্ষিকী প্রায় এসে গেছে, আর দু'চারদিন পরেই।

স্বামী বেচারার ইচ্ছে এই সুযোগে একটা ভাল উপহার দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেয়। একদিন সকালে, তখনও দৈনন্দিন বিসম্বাদ শুরু হয়নি, সে মোলায়েম স্বরে স্ত্রীকে বলল, 'ওগো, এই সামনের শনিবারেই তো আমাদের বিবাহবার্ষিকী।'

স্ত্রী একটা ধারালো ছুরি দিয়ে আলু কাটছিল। এই কথা শুনে সে গম্ভীর হয়ে গেল, আলুগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে কুচোতে লাগল।

একটু থমকিয়ে গিয়ে স্বামী বলল, 'আমি ভাবছি এই বছর তোমাকে একটা বালুচরী শাড়ি কিনে দেব। হাজার পাঁচেক টাকায় হবে না?'

বৌ কোনো জবাব না দিয়ে তরকারির ঝুড়ি থেকে একটা শক্ত গাজর তুলে কচাৎ-কচাৎ করে কাটতে গেল।

বৌয়ের হাবভাব দেখে স্বামী বেচারা এক ধাপ উঠে গেল, 'আচ্ছা একটা হিরের আংটি আট-দশ হাজার টাকায় হবে না।'

এতক্ষণে ছুরি চালনা বন্ধ করে বৌ জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও সব কিছু নয়, আমার ডাইভোর্স চাই।'

স্বামী বেচারা হতাশ হয়ে বলল, 'ওগো, সে আমার দ্বারা হবে না, সে যে অনেক খরচ।'

এর পরের গল্পে এই দম্পতিকেই নিয়ে আসি। তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে, দু'জনার মধ্যে গদগদ ভাব আছে। দু'জন গল্পগুজব করছে, এমন সময় বর বউকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি মরে গেলে তুমি দুঃখ পাবে?'

বৌ আর কি বলবে, বলল, 'হ্যাঁ।'

বর বলল, 'তুমি খুব কাঁদবে?'

বৌ বলল, 'হ্যাঁ।'

উৎসাহিত হয়ে বর বলল, 'একটু কেঁদে দেখাও না।'

বৌ বলল, 'একটু মরে দেখাও না।'

চিকিৎসা বিভ্রাট

এ বিষয়ে পরশুরামের সেই অবিস্মরণীয় গল্পটির পরে বাংলা ভাষায় আর কিছু লেখা বাতুলতা মাত্র।

তথাপি কৌতুকরসের সন্ধানে অনেক রকম অনধিকার চর্চা আমি করেছি। চিকিৎসক মহোদয়েরা রেহাই পাননি। বরং উল্টোপাল্টা হাসি ঠাট্টা কিঞ্চিৎ বেশি বোধহয় করে ফেলেছেন।

ইতিমধ্যে যদি কঠিন অসুখ হত, তাহলে অবশ্যই প্রাণ সংশয় হত, চিকিৎসকেরা চিনতে পারলেই, আমাকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতেন না। সুতরাং যাকে বলে ক্ষান্ত দেওয়া, ঠিক তাই দিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন ক্ষান্ত দিয়েছিলাম।

বিদেশে গিয়ে সম্প্রতি এক জগৎ বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানির একটা প্রচার পুস্তিকা পেয়েছিলাম। সেটি আদ্যপান্ত আধঘণ্টার মধ্যে আমি পাঠ করে ফেললাম এবং তাজ্জব বনে গেলাম। ডাক্তার ভরসা যাদের ব্যবসা, সেই ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি চিকিৎসকদের নিয়ে যে সব কেচ্ছা করেছেন, সেই তুলনায় আমার রচনাগুলি অতি পবিত্র, নিষ্পাপ।

এই পত্রিকার প্রথমেই রয়েছে, 'গরিব হওয়ার অনেক অসুবিধে, কিন্তু একটা বড় সুবিধে এই যে, ডাক্তারেরা আপনাকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলবেন।'

এই বক্তব্যের ব্যঞ্জনাটি পরিষ্কার।

এর পরের অনুগল্পটি হল এই ওষুধ কোম্পানির এক ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবকে নিয়ে। উক্ত সাহেব মেডিক্যাল চেক-আপ করাতে গিয়েছিলেন। একটি চিকিৎসক বোর্ড আগাপাশতলা, পায়ের গোড়ালি থেকে মাথার টাক পর্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে অবশেষে সাহেবকে জানিয়েছিলেন, 'চমৎকার স্বাস্থ্য রয়েছে। পঞ্চান্ন বছর বয়সের কারো পক্ষে এরকম শরীর-স্বাস্থ্য খুবই ভাল।'

দুঃখের বিষয় ওই ওষুধ কোম্পানির জনসংযোগ ডিরেক্টর জানিয়েছেন, 'আমাদের ভি.পি (ভাইস প্রেসিডেন্ট) মহোদয়ের বয়স মাত্র আটত্রিশ, তিনি চিকিৎসক

বোর্ডের এই প্রতিবেদন পেয়ে কেমন হকচকিয়ে গেছেন।

তেমন তেমন রোগীর হাত থেকে চিকিৎসকেরাও নিরাপদ নন।

এই বইতেই পড়লাম, এক রোগী কাশির অসুখে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন। ডাক্তার সাহেব দেখেশুনে ওষুধ দিলেন।

পরের দিন সকালে রোগী আবার এসেছেন চিকিৎসকের কাছে।

রোগী ডাক্তারের সামনে বসে কাশছেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আজকে দেখছি আপনার কাশির গমকটা অনেকটা কমেছে।'

রোগী জবাব দিলেন, 'তা কমবে না। আমি যে সারারাত রিহার্সাল দিয়েছি।'

এই গল্পটি পুরনো। হয়তো আমিও একাধিকবার লিখেছি। তবু এই বইতে আবার পড়লাম।

রোগী চেম্বারে ঢুকেছে। চিকিৎসক তাঁকে এক নজর দেখেই টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। ড্রয়ার থেকে একটা চেক বার করে ডাক্তার সাহেব রোগীর দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এই নিন।'

রোগী বললেন, 'এটা কি?'

চিকিৎসক বললেন, 'গতমাসে আপনার আমাশার চিকিৎসার পরে আপনি আমাকে যে চেকটা দিয়েছিলেন সেটা ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এসেছে।'

অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে রোগী চেকটা হাতে নিয়ে তারপরে পকেটে রেখে বললেন, 'কিন্তু ডাক্তারসাহেব আমার সেই আমাশাটাও যে আবার ফিরে এসেছে। সেই জন্যই যে আবার এত তাড়াতাড়ি আসতে হল।'

পুনশ্চ :

ডাক্তারসাহেবের কাছে গিয়ে ভোলা মিঞা বললেন, 'সাহেব, আমার শরীরে কোনো অসুখ নেই, কিন্তু মনে কিছু থাকে না। আপনি একটা কিছু করুন।'

ডাক্তারসাহেব বললেন, 'তার আগে আপনি আমার ভিজিটটা দিয়ে দিন।'

ইতস্তত

গঙ্গারাম

আমাদের সাদাসিধে ভাল মানুষ গঙ্গারাম এক দার্শনিক সমস্যায় পড়েছে। সমস্যাটি প্রাণীবিদ্যাজনিত।

প্রাণীবিদ্যায় দর্শনের অনুপ্রবেশের কি সুযোগ থাকতে পারে—এ বিষয়ে যাঁরা ভাবিত তাঁদের জন্যে গঙ্গারামের সমস্যা দুটি নিবেদন করছি।

প্রথম সমস্যা দেখা দিয়েছিল চিড়িয়াখানায়। কলকাতা চিড়িয়াখানায় উটপাখিরা থাকে একটা খালের ওপারে লম্বা টানা জমিতে আরও কিছু কিছু জীবজন্তুর সঙ্গে।

উটপাখি দেখে বিশেষ বিস্মিত বোধ না করলেও গঙ্গারাম স্বাভাবিক কারণেই, চিড়িয়াখানায় তার সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'উটপাখিগুলোর গলা এত লম্বা কেন?'

ঠিক জিজ্ঞাসা নয়, প্রশ্নটা ছিল প্রায় স্বগতোক্তির মতো। কিন্তু এই প্রশ্নেই পাশের বন্ধুটি বললেন, 'তুমি অবাক করলে দেখি! দেখছো না উটপাখির মাথাটা কত উঁচুতে।'

গঙ্গারাম বিস্মিত হয়ে বলল, 'তাই কি হয়েছে? তার জন্যে গলা এত লম্বা হতে হবে?'

বন্ধুটি বললেন, 'অত উঁচুতে থাকা মাথাটা ধড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখতে গেলে এর চেয়ে ছোট গলায় হবে না। তাই উটপাখিদের গলা এত লম্বা। ঘাড়ের ধার থেকে একেবারে মাথা পর্যন্ত।'

এর পরের ঘটনাটি আরও গোলমেলে।

গঙ্গারাম পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের বাড়িতে দুটো কুৎকুতে ডাকসুণ্ড কুকুর। এই কুকুরগুলো খুব বেঁটে জাতের। পাগুলো কচ্ছপের মতো ছোট ছোট।

কুকুর দুটোকে দেখে গঙ্গারাম কুকুরের মালিককে বলল, 'আপনার কুকুরগুলোর

পা এত ছোট যে পা নেই বললেও চলে।'

এ কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'পা থাকবে না কেন? যতটা লম্বা হওয়া দরকার তাতো আছে, মেঝে তো ছুঁয়েছে।'

অকাট্য যুক্তি।

কিন্তু উটপাখির লম্বা গলা এবং কুকুরের সংক্ষিপ্ত পা, এই দুইয়ের কার্যকারণ চিন্তা আজ কিছুদিন হল গঙ্গারামকে দার্শনিক করে তুলেছে।

শুভ নববর্ষ

গত সপ্তাহে কলকাতার বাইরে ছিলাম, নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানো হয়নি। তার আগের সপ্তাহে বড়দিন নিয়ে অত কথা লিখলাম কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের শুভ বড়দিন জানাতেও ভুলে গেছি।

পরে ভেবে দেখলাম, ভুল হলেও দোষ কিছু হয়নি। বড়দিনের ক্ষেত্রে হয়নি।

বড়দিন ধর্মীয় ব্যাপার। যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন। এর সঙ্গে একটা উৎসব। সেই উৎসবটা অবশ্য খুব জনপ্রিয়। যেমন দুর্গাপূজা জনপ্রিয়, যেমন ইদ।

কিন্তু বড়দিন, ইদ, দোল-দুর্গাপূজা সবই তো ধর্মীয় ব্যাপার। হিন্দুদের যেমন জন্মাষ্টমী (কৃষ্ণের জন্মদিন)। মুসলমানদের ফতেহাদোয়াজ দাহাম হজরত মহম্মদের জন্মদিবস তেমনি খ্রীষ্টমাস বা বড়দিন যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিবস। কোন খ্রীষ্টানই জন্মাষ্টমী বা ফতেহাদোয়াজ দাহামে শুভেচ্ছা কাউকে জানাতে যাবে না। হিন্দু বা মুসলমানের সুখী খ্রীষ্টমাস বা শুভ বড়দিন জানানোর প্রয়োজন নেই।

তবে নববর্ষ ধর্মীয় ব্যাপার নয়। ইংরেজি নববর্ষ হলেও, সারাদেশে এখন এই ক্যালেণ্ডারই মানা হয়।

সুতরাং কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হলেও পাঠক-পাঠিকাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। চলতি কথায় আছে, 'যাবৎ দোল, তাবৎ কোল।' অর্থাৎ দোল পর্যন্ত বিজয়ার কোলাকুলি চলে। সেই রীতি মান্য করেই এই শুভেচ্ছাজ্ঞাপন।

মশার‍্যারি

অ-কার কিংবা আকারের সঙ্গে অ-কার কিংবা আ-কার যুক্ত হলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। উদাহরণ : মশা + অরি = মশারি। স্বরসন্ধি। আবার মশারি সমাস করলে ব্যাসবাক্য হল মশার অরি, মশারি। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

আমার ছোটভাই বিজন মশারি টাঙিয়ে শুতে পারে না। এমনিতে মশারি টাঙানো না থাকলে বিছানাতে শুয়ে থাকে কিন্তু মশারি টাঙালেই বিপদ, মশারি জড়িয়ে বিছানা থেকে মেঝেতে পড়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই সল্টলেকে মশার যা অত্যাচার

মশারি না টাঙিয়ে শোওয়া অসম্ভব।

ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। কালকের রাত ধরে এর মধ্যে বিজন এগারোবার মশারি ছিঁড়ে পড়ে গেছে।

মশারি যদি মশার অরি হয়, তবে বিজনকে বলা চলে মশারির অরি, সন্ধি করে মশারি + অরি = মশার্যরি।

তথাপি

শান্তিনিকেতন গিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে নানা রকম লিখেছি। একটু এখনও বাদ রয়ে গেছে।

প্রথমে একটি পরামর্শ। যদি একাধিক দিনের জন্য শান্তিনিকেতন গিয়ে থাকতে চান লম্বা প্লাস্টিকের জগ থেকে সরাসরি গলায় ঢেলে জলপান করা অভ্যেস করুন। শান্তিনিকেতনে কোথাও কোনও গেলাস নেই, ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে, হোটেলে, কালোর বা নবদ্বীপের বিখ্যাত দোকানে কোথাও কোনও গেলাস নেই। খাওয়ার টেবিলে একটি করে জগ যার গায়ে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা আছে, 'নিজের গলায় নিজে ঢালুন।' এ কাজে আমি দক্ষ নই, অভিজ্ঞতাও কম। প্রত্যেকবারই জল খেতে গিয়ে জামাকাপড় ভিজিয়েছি।

আরেকটা ছোট ব্যাপার বলে শেষ করছি।

শান্তিনিকেতনে আমরা যে অতিথিশালায় উঠেছিলাম, তার নোটিশ বোর্ডে সময় তালিকা ছিল এইরকম :

প্রাতরাশ...সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৯টা। মধ্যাহ্ন ভোজন...সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ৩টা। বৈকালিক জলযোগ...বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে ৭টা। নৈশ ভোজন...সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা। বিজ্ঞপ্তিটি মনোযোগ দিয়ে আমার স্ত্রী বহুক্ষণ পড়লেন, তারপর আমাকে বললেন, 'খেতেই যদি এত সময় যায়, শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখব কখন?'

রেস্তোরাঁয় শোনা কথা

এক পেয়ালা চা খেতে একটা পুরনো রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিলাম। একদা লোকে রেস্তোরাঁয় প্রধানত চা খেতেই যেত। আজকাল এগুলো সব খাবারের দোকান হয়েছে। এক পেয়ালা চা চাইলে বিরক্ত বোধ করে। আমি অনেক ভেবে চিন্তে একটা মাটন চপও অর্ডার দিলাম, সেও দাম কম নয়—ছয় টাকা।

চপ এল। কিন্তু খেতে গিয়ে মনে একটা সংশয় দেখা দিল, সত্যিই মাটন চপ এটা? কোথাও মাংসের ছিটেফোঁটা দেখছি না। বেয়ারাকে ডেকে বললাম, 'এটা

কি মাংসের চপ? মাংস কোথায়?'

বেয়ারা বলল, 'মাংস? মাংসের চপে মাংস থাকবে কেন?'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকায় বেয়ারা বলল, 'দাদা, মাংসের চপে মাংস? এরপরে বলবেন কবিরাজি কাটলেটে কবিরাজ কোথায়? আফগানি চপে আফগান দাও। কাশ্মীরি পোলাওয়ে কাশ্মীর চাইবেন?'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

ঘুষ

ঘুষের এখন খুব রমরমা চলছে।

সকালবেলা উঠে খবরের কাগজগুলো দেখলে চিন্তা হয় যদি ঘুষের খবর না থাকত তবে সেখানে কি ছাপা হত?

কলকাতা অবশ্য দুর্নীতির খবরের ব্যাপারে দিল্লির থেকে অনেক পিছিয়ে। তবে সম্প্রতি কলকাতা দুর্নীতির ঘুষের খবরে কিছুটা জায়গা করে নিয়েছে।

আমার এক বন্ধু জেল সুপারিন্টেডেন্ট। কলকাতার একটি বড় জেলের দায়িত্বে আছেন। ঘুষের মামলায় আসামিদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তি। সমাজের মাথা সব। এই রকম কেউ কেউ বন্ধুবরের জেলে রয়েছেন।

সেদিন রবিবার সন্ধ্যায় বন্ধুটি আমাদের বাসায় আড্ডা দিতে এলে তাকে বললাম, 'তোমার জেলে তো অমুকবাবু রয়েছেন।'

বন্ধু বললেন, 'হ্যাঁ, খবরের কাগজেই তো বেরিয়েছে সে সংবাদ।'

আমি বললাম, 'কেমন দেখছো ব্যক্তিটিকে?'

বন্ধু বললেন, 'সাংঘাতিক।'

আমি জানতে চাইলাম, 'মানে?'

বন্ধু বললেন, 'প্রথম সাক্ষাতেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'ঘুষ খেয়ে জেলে এসেছি, ঘুষ দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

প্রভৃতি

নিষিদ্ধ

রাতে শোয়ার আগে মা মেয়ের ঘরে এসেছেন পড়বার জন্যে একটা গল্পের বই নিতে।

মেয়ের বয়েস সতেরো-আঠারো। মেয়ের শিয়রের কাছে তাকে অনেকগুলো বই। মা সেই বইগুলি হাত দিয়ে বাছতে লাগলেন, মেয়ে হঠাৎ বাধা দিল, 'মা, তুমি ওই বইগুলো ঘাঁটতে যেও না।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি?'

মেয়ে বলল, 'তুমি এদিকে সরে এস, আমি তোমাকে বই বেছে দিচ্ছি।'

মা বললেন, 'আমি বেছে নিলে কি দোষ হবে?'

মেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'এর মধ্যে এমন অনেক বই আছে যা তোমার উপযুক্ত নয়।'

মিস্ত্রি

শান্তি সমাচারে মিস্ত্রির কথায় একটা গল্প বাদ পড়ে গেছে। আমার ভাঙা মোটরগাড়ির মিস্ত্রি বলল, একটা চকার বকার কিনতে হবে। নিজে হাতে না কিনে আগে অনেক ঠকেছি তাই এবার স্বয়ং দোকানে গেলাম, গিয়ে বললাম, 'একটা চকার-বকার দিন।'

দোকানদার বললেন, 'আপনি গাড়ির মালিক না মিস্ত্রি?'

আমি বললাম, 'মিস্ত্রি হব কেন, আমি মালিক।'

দোকানদার বললেন, তা হলে মিস্ত্রির ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছেন কেন? চকার-বকার নয়, বলুন শক অ্যাবজর্বার।

ডাক্তারবাবু

সকলেরই যেমন হয়, আমার দুয়েকজন ডাক্তারবাবু শত্রু আছেন। কিন্তু ভাগ্যের কথা, ডাক্তারবাবু বন্ধুর সংখ্যা কিছু বেশি।

ডাক্তারবাবুরা না থাকলে যেমন আমরা থাকতে পারি না, তেমনি আমরা না থাকলে ডাক্তারবাবুরাও থাকতে পারতেন না।

সে যা হোক, ডাক্তারবাবু কিন্তু সকলের সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। নিচের ঘটনাটি দেখুন।

এক মহিলার স্বামী ঘুমের মধ্যে কথা বলেন। মহিলা ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছেন, ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রমহিলার স্বামীর ঘুমের মধ্যে কথা বলা মোটেই কমেনি।

আবার ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন, দিয়ে বললেন, 'চেষ্টা তো করছি। কিন্তু কি ভাবে কথা বলাটা বন্ধ করব কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এই শুনে, অনেক চিন্তা করে ভদ্রমহিলা বললেন, 'ডাক্তারবাবু তা হলে থাক, ঘুমের মধ্যে ওঁর কথা বলা বন্ধ না করলেও চলবে। আপনি বরং একটা কাজ করুন। ঘুমের সময় আমার স্বামী যে বিড়বিড় করে কথা বলেন, ওঁর গলার আওয়াজটা একটু বাড়িয়ে দিন, যাতে কি বলছেন সেটা আমি বুঝতে পারি।'

উকিলবাবু

এক বিখ্যাত উকিলকে তাঁর এক মক্কেল তাঁর বাড়িতে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মক্কেল ভদ্রলোক আশা করেননি যে উকিলবাবু আসবেন। তাই উকিলবাবুর জন্য বিশেষ অপেক্ষা না করে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে খেতে বসে গিয়েছিলেন।

এমন সময় উকিলবাবু এসে উপস্থিত। ভোজের মাঝখানে এসে উকিলবাবু বিব্রত বোধ করছেন। আবার গৃহকর্তা নিজেই খেতে বসে গিয়ে বোকা বনে গেছেন, তিনি আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি আশা করিনি যে আপনি আসবেন।'

উকিলবাবু এর জবাবে বললেন, 'আমিও ঠিক করেছিলাম যে আসব না। কিন্তু পরে ভুলে গেলাম যে ঠিক করেছি আসব না। তাই শেষ পর্যন্ত দেখছি চলে এলাম।'

অধ্যাপিকা চক্রবর্তী প্রেরিত এই বইয়েরই এক জায়গা পেলাম এক অভিনব শিশু সমীক্ষা।

এক মনোবিদ্যার সমীক্ষক বেশ কিছুদিন ধরে শিশুমন নিয়ে চর্চা করছেন। সমীক্ষার নানা জিনিসপত্রের মধ্যে তাঁর কাছে রয়েছে একটা বেড়াল ছানার ছবি, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ছবির বেড়াল ছানাটি কাঁদছে।

সেই সমীক্ষক একটি গরিবের বাড়ির শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছবিতে কি দেখছো?'

দরিদ্র ঘরের শিশুটি বলল, 'ও খেতে চাইছে। কিন্তু ওর মা বলছে, এখন নয়। এখন কোনও খাবার নেই। খাবার জোগাড় হলে তখন খাবে।'

এবার ধনীগৃহের শিশুটির পালা। সেও ঠিকই ধরতে পেরেছে এটা ক্রন্দনরত বেড়াল ছানার ছবি। কিন্তু তাকে যখন বলা হল, 'বেড়ালছানাটা কেন কাঁদছে?' সে বলল, 'ওর মা ওকে জোর করে খাওয়াতে চাচ্ছে, কিন্তু ও বলছে আর খাবে না। আর খেতে পারবে না, সেই জন্যে কাঁদাকাটি করছে।'

আপাতত এই মহামূল্যবান গ্রন্থ আমি আমার টেবিলের সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখছি। পরে প্রয়োজন হলে আবার খুলব। ততদিন আমি নিজেও আর পড়তে যাব না। কারণ পড়লেই টুকতে ইচ্ছা করবে।

চারদিকে পরীক্ষার সিজন চলছে। এই সময়ে টোকাটুকির মধ্যে যাওয়া উচিত হবে না।

সিজন শেষ হলে তখন না হয় আরেকবার বই খুলে দেখা যাবে।

সিজন

সিজনের কথাই যখন এল তখন আমার পুরনো সমস্যাটা আরেকবার উত্থাপন করি।

বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি, এটা সিজন চেঞ্জের সময়, খুব সাবধানে থাকবে। এই ষাট বছর বয়সে পৌঁছে আমি বুঝেছি সিজন সব সময়ই চেঞ্জ হচ্ছে। কখনও হিমেল বাতাস উষ্ণ হচ্ছে, উষ্ণ গ্রীষ্ম বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে, বৃষ্টি কেটে গিয়ে হিমেল বাতাস আবার ফিরে আসছে, নিবিড় শীতের দিন ফিরে আসছে সে শুধু উষ্ণতায় পৌঁছানোর জন্যে। বছরে একটা দিনও নেই যা কোনও নির্দিষ্ট ঋতুর। ঘোরতর গ্রীষ্মের দিনেও সিজন চেঞ্জ, ঘোরতম শীতেও সিজন চেঞ্জ।

অনেকদিন আগে, একবার পুজোর ছুটির পরে কলকাতায় ফিরে ধর্মতলায় অধুনালুপ্ত কমলালয় স্টোর্সে একটা ফুলশার্ট কিনতে গিয়েছিলাম। আধাসুতো, আধাপশমের কটস উল তখন খুব ফ্যাশন। একটা কটস উলের জামা এগিয়ে দিয়ে কমলালয়ের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি সেলসস্যান বলেছিলেন, 'এই নিন একটা অল সিজন শার্ট।'

আমি বলেছিলাম, 'এই আধা উলের জামা গরমে গায়ে দেব কি ভাবে?'

তুখোড় সেলসম্যান মনোরঞ্জক হাসি হেসে বললেন, 'ঠাণ্ডায় গায়ে দেবেন, গরমে তুলে রাখবেন, সেই জন্যেই তো অল সিজন জামা।'

গুলি

বাংলা অভিধানে, চলন্তিকায় রাজশেখর বসু গুলি শব্দটির একাধিক অর্থ দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রধান দুটি হল :

(১) বন্দুকের গুলি, বুলেট।

(২) আফিম হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য।

বন্দুকের গুলি খুব সাংঘাতিক, বিপজ্জনক জিনিস। এর থেকে শত হস্ত দূরে থাকলেও নিস্তার পাওয়া যায় না।

আমি বন্দুকের গুলির একটা মাত্র গল্প জানি। সেই গল্পটাই বলছি। তার আগে যুদ্ধক্ষেত্রের একটা প্রবাদবাক্যের কথা বলি। যুদ্ধের সময় গুলিতে কে কখন মারা যাবে তার ঠিক নেই। প্রত্যেকটি গুলিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখা আছে, শুধু সে-ই সে গুলিতে মারা পড়বে। সৈন্যদের বলা হয় অযথা ভয় করে লাভ নেই।

সে যা হোক বুলেট বা গুলির গল্পটা আগে বলি।

কলকাতার এক বিখ্যাত সিনেমাহলের দারোয়ানের গলায় এবং ইউনিফর্মের ওপরে বহু মেডেল ঝুলতো।

তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ভাই তুমি এসব মেডেল কিভাবে পেলে?'

সে বলল, 'একবার একটা জান বাঁচিয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'কি রকম?'

সে বলল, 'বড় সাহেবের শখের কুকুর পাগলা হয়ে গিয়েছিল। বড় সাহেব হুকুম দিলেন, কুত্তাকে গুলি করে মেরে ফেলো। আমি হুকুম শুনে পর পর দুবার গুলি করলাম। একটা গুলিও লাগল না, কুকুরটা বেঁচে গেল।

আমি বললাম, 'পাগলা কুকুর বাঁচিয়ে রাখার জন্য তোমাকে এত মেডেল দিলে?'

হাতের তালুতে খৈনি টিপতে টিপতে দারোয়ানজি বলল, 'পরে দেখা গেল কুকুরটা পাগল ছিল না। তার নাকের মধ্যে কয়েকটা পিঁপড়ে ঢুকে গিয়েছিল। তাই পাগলের মতো ঘেউ ঘেউ আর ছুটোছুটি করছিল।'

অতঃপর কবুল করি, এ গুলির গল্প ঠিক আমার জন্য নয়। চণ্ডুর গুলির কথা

বরং বলা যাক।

চণ্ডুর গুলি কি জিনিস আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু সংসদ বাংলা অভিধানে দেখছি, গুলিখোর মানে চণ্ডুখোর। গুলি আসলে নেশার জিনিস, আফিং তথা ভাং তথা চণ্ডুর ছোট সাইজের নাড়ু।

মদ, তাড়ি, ওয়াইন বিয়ার এইসব হল তরল নেশার জিনিস। পাত্রে ধরে পান করতে হয়। গাঁজা, তামাক হল ধোঁয়াটে নেশা। আর সলিড বা কঠিন নেশা হল চণ্ডু বা গুলি। চরস, ভাং বা সিদ্ধি দিয়ে তৈরি।

এইভাবে পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের যাবতীয় নেশার জিনিসকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। কঠিন, তরল এবং বায়বীয়।

অবশ্য এই ড্রাগের যুগে গাঁজা, ভাং, সিদ্ধি দুর্লভ হয়ে পড়ছে। বহু দেশেই এইসব নেশার দ্রব্য তখন বেআইনি।

ড্রাগ বেআইনি। পৃথিবীর বহু দেশেই ড্রাগ ব্যবসায়ীদের ধরা পড়লে চরম দণ্ড পেতে হয়। কিন্তু তবু ওই বহুমূল্য প্রাণঘাতী নেশার জিনিসের চাহিদা ও যোগান সারা পৃথিবীতেই বিস্তৃত। আধুনিক পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি টাকার ব্যবসা, এমন কি অস্ত্র ব্যবসার চেয়েও মহার্ঘ ব্যবসা হল ড্রাগ নিয়ে।

একদা, এই আমাদের বাল্যকালেই গ্রাম-শহরে, পাড়ায়-পাড়ায় গেঁজেল ও গুলিখোরদের দেখা মিলত তারা অধিকাংশই ছিল প্রবীণ। আমি অল্প বয়সে এমন কি বৃদ্ধা মহিলাদের আফিংয়ের গুলি খেতে দেখেছি। আজকাল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। উঠতি বয়সের জীবনের অবলম্বন হারিয়ে ড্রাগের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে।

আলোচনা খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে। আমার পাঠক-পাঠিকারা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ার আগে গুলির গল্পে যাই।

গুলির গল্প মানে গুলিখোরের গল্প। এইসব গুলিখোরেরা এখন আর কোথাও নেই, পৃথিবী থেকে তারা চিরতরে হারিয়ে গেছে।

গুলিখোরেরা আধা বাস্তব, আধা কল্পনার পৃথিবীর লোক। তারা তির্যক বুদ্ধির অধিকারী।

গুলিখোরদের বিষয়ে প্রথম গল্পেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

দুই গুলিখোর একটা গহন জায়গায় এসেছে। জায়গাটা তাদের কাছে একেবারেই অচেনা। পথ-ঘাট কিছু চেনে না, কোনো লোকজনের সঙ্গেও জানাশোনা নেই। এদিকে দুজনারই গুলির নেশা চরচরিয়ে উঠেছে। অবশিষ্ট গুলি যা তাদের সঙ্গে ছিল সেটাও খরচ হয়ে গেছে।

ইচ্ছে করলেই দোকান-বাজারে গুলি কেনা যাবে না। প্রত্যেক এলাকাতেই

গুলির আড্ডা আছে, শুধুমাত্র সেই গোপন আড্ডাতেই গুলি পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু সেই গোপন আড্ডার সন্ধান পাওয়া যাবে কিভাবে? দুজন পরদেশি মানুষ সেই আড্ডায় কিভাবে পৌঁছবে?

এই দুই গুলিখোর লোকজন যাতায়াত করার পথে এক গলির মুখে দুজনে দুদিকে দাঁড়াল। তারপর হাতের তালু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুজনে দুপ্রান্ত থেকে একটা অদৃশ্য দড়ি পাকানোর অভিনয় করতে লাগল।

রাস্তার লোকেরা কেউ লক্ষ্য করল, কেউ লক্ষ্য করল না। যারা লক্ষ্য করল তারা ধরে নিল, দুটো নতুন পাগল এসেছে এলাকায়। কিন্তু এরই মধ্যে একজন হঠাৎ কাল্পনিক দড়িটার ঠিক সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর দড়ি পাকানোয় ব্যস্ত তাদের দুজনকে এক অচেনা লোক বলল, 'দাদারা দড়িটা একটু তুলুন, যেতে পারছি না যে।'

সঙ্গে সঙ্গে নবাগত গুলিখোর দুজন অনুরোধকারীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'আপনার জন্যেই দড়ি পাকাচ্ছিলাম দাদা, আপনাদের আড্ডাটা কোথায় বলুন। নেশা না করতে পেরে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

গুলিখোরদের সম্পর্কে অন্য গল্পটি অনবদ্য।

এ গল্প পাঁচ গুলিখোরের। জমজমাট গুলির আড্ডায় হঠাৎ একজন ঘোষণা করল, 'আমি মরে গেছি। আমি আর বেঁচে নেই, আমি একজন মরা!'

বলাবাহুল্য এরপর বাকি চারজনের ওপরে গিয়ে পড়ল গুরুদায়িত্ব। বন্ধুর মৃতদেহ তাদের সৎকার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়া যোগাড় হল। দস্তুর মতো হিন্দু মতে খই ছড়াতে ছড়াতে, হরিনাম করতে করতে চার শববাহক পঞ্চম জীবিত বন্ধুর দেহ মৃতদেহের মতো খাটিয়ায় তুলে শ্মশানের দিকে রওনা হল।

কিন্তু নেশার ঘোরে তারা ভুল পথে ঘুরতে লাগল। শ্মশানের পথ আর তারা খুঁজে পায় না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তারা খাটিয়া ফুটপাথে নামিয়ে জিরোতে বসল।

এবার পঞ্চম ব্যক্তি মানে মরা খাটিয়ায় উঠে বসল। তারপর শববাহকদের বলল, 'হায় রে, কাশীমিত্র ঘাটের শ্মশান, নিমতলার শ্মশান, কেওড়াতলার শ্মশান সবই চিনি। কিন্তু আমি যে মরা, তাই কিছু বলতে পারছি না।'
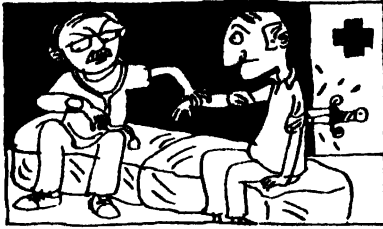
সুখ-অসুখ

সুখ-অসুখ নামে এই রম্যনিবন্ধ রচনায় হাত দিয়েই সংশয় হচ্ছে বিষয়টা পুরনো হয়ে গেল। এ নামে এবং এ বিষয়ে হালকা রচনা আমি অবশ্যই ইতিপূর্বে লিখেছি। শুধু নাম বা বিষয়ই এক নয়, হয়ত নিবন্ধ মধ্যবর্তী দুয়েকটি কাহিনীও পূর্বকথিত।

কিন্তু আমাকে দোষ দিয়ে লাভ কি?

কারণে, অকারণে, অনুরোধে, উপরোধে, অর্থলোভে আমি গত পনেরো বছরে সহস্রাধিক রম্যরচনা লিখেছি। সে গুলোর মধ্যে পৌনঃপুনিকতার দোষ রয়েছে। সবাই জানেন, এই সব অধিকাংশ লেখা হাবি-জাবি উলটো-পালটা।

তথাপি এসব রচনা পাঠক-পাঠিকা কেন ভালবেসে পড়ছেন, কেন সম্পাদক মহাশয় চেয়ে নিয়ে ছেপেছেন, কেন প্রকাশক গ্রন্থাকারে বছরের পর বছর সেই একই রদ্দি রচনামালা যত্ন করে প্রকাশ করেছেন, সে রহস্য আমার কাছে এখনো অজ্ঞাত।

এসব বাজে কথা থাক। আপাতত নিবন্ধ নামের মধ্যে প্রবেশ করি। সুখ-অসুখ মানে সুখ ও অসুখ। প্রিয় পাঠিকা, মনে আছে হাঁকমাক জগদীশচন্দ্র ঘোষের বাংলা ব্যাকরণ, মনে পড়ছে দ্বন্দ্ব সমাস? রাধাকৃষ্ণ, চাচা-কলকাতা, মান-অপমান? সুখ-অসুখ ঐ রকমই।

এরই কাছাকাছি সুখ-অসুখ, অসুখ-বিসুখ আছে।

সুখ-বিসুখ আর সুখ-অসুখ প্রায় একই। তবে অসুখ বিসুখ খুব গোলমেলে ব্যাপার। এর মধ্যে সুখের কোন স্থান নেই।

এখানে অসুখ-বিসুখের একটা ছোট নমুনা দেই।

সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে এক রোগী এসেছেন। ভদ্রলোকের ভয়াবহ কাশি হয়েছে। কাশতে কাশতে দম ফেলতে পারছেন না।

ডাক্তারবাবু কাশির একটা ওষুধ দিলেন। পরদিন সকালে সেই রোগী আবার ডাক্তারের চেম্বারে এসেছেন। না, কাশি কমেনি।

ভদ্রলোক কেশেই চলেছেন। তবে আজ সকালে কাশিটা গতকাল সন্ধ্যের মতো ফ্যাঁসফেঁসে, গলাবোজা কাশি নয়। কাশির বেগটা একটু যেন হালকা হয়েছে। ডাক্তারবাবু দেখেশুনে বললেন, 'আজ সকালে তো কাশিটা দেখছি অনেক হালকা হয়েছে, সহজ হয়েছে।'

খুক-খুক করে কাশতে কাশতে রোগী বললেন. 'সে আপনার ওষুধের গুণে নয়।'

রোগী বললেন, 'কাল সারারাত না ঘুমিয়ে কাশি প্র্যাকটিস করেছি, তাই আজ সকালে কাশতে পারা একটু সোজা হয়ে গেছে।'

হাঁচি-কাশিও প্র্যাকটিস করে আয়ত্তে আনা যায়। এই গল্পটা শোনা না থাকলে বোঝা যাবে না যে এই রোগীর ক্ষেত্রে আগের দিন সন্ধ্যায় যেটা অসুখ ছিল, পরের দিন সকালে সেটা বিসুখ হয়েছে।

বিসুখ প্রথমে আসে না। অসুখের পরে বিসুখ আসে। বিসুখ কখনো অসুখের চেয়ে ভাল, কখনো অসুখের চেয়ে খারাপ।

সর্দির নাকি কোন ওষুধ নেই। এক ভদ্রমহিলা সর্দির চিকিৎসা করতে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবু সৎ লোক. রোগিনীর অযথা অর্থব্যয় হয় এমন চান নি।

ডাক্তারবাবু তার চিকিৎসাপ্রার্থিনীকে পরিষ্কার বলেছিলেন. 'ম্যাডাম, সত্যি কথা বলছি। সর্দির কোন চিকিৎসা নেই, ওষুধ নেই। সেই কথাটা জানেন তো, চিকিৎসা করলে সর্দি এক সপ্তাহে সারে, চিকিৎসা না করলে সর্দি সারতে সাতদিন লেগে যায়।'

ধনবতী মহিলা, তিনি এত সহজে চিকিৎসার অধিকার হতে বঞ্চিত হবেন না। ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি ঝমঝম বৃষ্টিতে আলুথালু ভিজলেন। তারপর সেই ভেজা জামাকাপড়ে বাড়ি ফিরে ছয় ঘণ্টা ঠাণ্ডা মেশিন চালিয়ে বন্ধ ঘরে পাখার নিচে বসে রইলেন।

বলাবাহুল্য এর পর ভদ্রমহিলার নিমুনিয়া হল। তখন তিনি ডাক্তারবাবুকে বাড়িতে কল দিলেন।

ডাক্তারবাবু এলে তাকে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, এবার তো সামান্য সর্দি নয়, আমার নিমুনিয়া হয়েছে। নিমুনিয়ার তো চিকিৎসা আছে, এবার আপনি আমার চিকিৎসা করুন।'

ডাক্তারবাবু অতঃপর কি করেছিলেন জানি না। কিন্তু আপাতত আর অসুখ নয়, এবার বিসুখে যাই।

গ্রীক ট্রাজেডির এবং মহাকাব্যের চরিত্রবৃন্দ ব্যতীত বাকি সাধারণ মানুষেরা

সুখে থাকতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যনাট্য 'গান্ধারীর আবেদন' রচনায় দেখেছি ট্রাজেডি নায়ক মহাবীর দুর্যোধন পিতৃদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, 'সুখ? সুখ চাহি নাই মহারাজ।'

অবশ্য সুখ জিনিসটা কি এ বিষয়ে সম্যক ধারণা সকলের থাকে না। সকলের কেন, হয়ত কারোর থাকে না।

অনেকে বুঝতেই পারেন না যে তিনি সুখে আছেন। শুধু অল্পদিন পরে টের পান, নিজের মনেই স্বগতোক্তি করেন, 'সেই সময় আসানসোলে কি সুখে ছিলাম।' স্ত্রীকে ডেকে বলেন, 'হ্যাঁ গা মনে আছে? নাইনটিন সেভেনটি সেভেন, আসানসোল, তিরিশ টাকা কেজি মাংস।' তারপর আর একটু মনে পড়ে যায়, 'তবে দুলু কসাই ওজনে বড় ঠকাতো।'

কিছুটা ঠকালেও এই বিশ-বাইশ বছর পরে, গৃহস্থ পিছন দিকে ফিরে দেখতে পান সে সময়টা বেশ সুখেই ছিলেন।

প্রতিভা বসুর অসাধারণ স্মৃতি কথা, 'স্মৃতি সতত সুখের'। অতীতের একটা মোহ আছে, অতীতের সুখস্মৃতি বর্তমানকে আনমনা করে দেয়। সদা-সর্বদাই মনে হয় আগে কত সুখে ছিলাম। পুরনোদিনের জন্যে, ফেলে আসা সময়ের জন্যে দুঃখ হয়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বর্তমানেও সুখী ছিলেন। তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্টতই কবুল করেছেন, সুমধুর ছন্দে বলেছেন,

'আমি যে নেহাৎ সুখে আছি,
অন্তত নই দুঃখে কৃশ,
এই কথাটা পদ্যে বলতে
লাগছে ভীষণ বিসদৃশ।'

বহুকাল আগে এক বৈষ্ণব অবশ্য ঠিক এর বিপরীত কথা বলেছিলেন, সে বয়ান তো বাঙালি মাত্রেরই জানা,

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।'

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হাজার হাজার মানুষ এই পংক্তির মধ্যে নিজের মর্মবেদনার, দীর্ঘশ্বাসের প্রতিবিম্ব খুঁজে পেয়েছে।

আর কবিতা নয়। রম্য নিবন্ধের পক্ষে কাব্য কথা কিঞ্চিত বেশি হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

এক ব্যক্তি তার নতুন বাড়ির নামকরণ করেছিলেন 'সুখ'। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'কেমন আছেন?' তিনি বলতেন, 'সুখে আছি।' যদি জিজ্ঞাসা

করত, 'কোথায় আছেন?' তা হলেও বলতেন, 'সুখে আছি।'

এই মহানগরের এক অসাধারণ অধিবাসীর কথা শুনেছি। তিনি নাকি তার গায়ে যে সাইজের গেঞ্জি লাগে তার চেয়ে দু'সাইজ কম মাপের গেঞ্জি টেনেটুনে কষ্ট করে পরেন।

না। ছত্রিশের জায়গায় বত্রিশ সাইজের গেঞ্জি কিনে সামান্য কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্যে তিনি এটা করেন না। তিনি তেত্রিশ বোকা নন।

ভদ্রলোকের বক্তব্য হল, বাজারে কাঁচালঙ্কার কেজি ষাট টাকা-আশি টাকা, ছোট মৌরলা মাছের কেজি সোয়াশো টাকা। ট্রামে-বাসে গাদাগাদি দম বন্ধ ভিড়। অফিসে গিয়ে সেখানে বড় সাহেবের ভ্রূকুটি। গৃহে গৃহিণীর লাঞ্ছনা।

এত সব কিছুর পর দিনের শেষে বাড়ি ফিরে ভদ্রলোক যখন ঐ শক্ত, টাইট হয়ে বসে যাওয়া ঘামে ভেজা গেঞ্জি অনেক কসরত করে শরীর থেকে খোলেন, পরম আরাম ও তৃপ্তি, পরম সুখ অনুভব করেন। এছাড়া সুখ পাওয়ার মতো তার নির্যাতিত জীবনে আর কিছুই নেই।

মহাত্মা বার্টান্ড রাসেল, যিনি একদা 'সুখের সন্ধানে' নামে বই রচনা করেছিলেন, সেই বহু পঠিত গ্রন্থের লেখক দার্শনিক রাসেল যথাকালে এই ভদ্রলোকের দেখা পেলে হয়ত সুখের বিশ্লেষণ একটু অন্যরকম করতেন।

পুনশ্চ:

বহুকাল আগে একটা বিলিতি ম্যাগাজিনে একটা অসামান্য কার্টুন দেখেছিলাম।

ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বসে আছেন এক ব্যক্তি। তার পিঠে আমূল প্রোথিত একটি ছোরা।

ডাক্তারবাবু নাড়ি দেখছেন, রোগীটি বলছে, 'না কোন অসুবিধে নেই। শুধু যখন জোরে হাসি বুকে-পিঠে একটু ব্যথা লাগে।'

আমি অদ্যবধি ঐ কার্টুনটির কথা ভাবি এবং আজো ভাবি ঐ ছুরিকাহত ভদ্রলোক সুখে আছেন না দুঃখে আছেন।

ছুরিকাহত অবস্থায় যে মানুষ হাসতে পারে তার পক্ষে দুঃখে থাকা নিশ্চয় সম্ভব নয়।

আধা আধি

আমরা বলতাম, 'হিজ হুজ।'

ইংরেজি ভাষার এমন সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। 'হিজ, হুজ' মানে যার-যার, তাব-তার। মানে দোকানে বসে দু'জনে দু'কাপ চা খেলাম, কিংবা রাস্তার মোড়ে দু'জনে দুটো ডাব খেলাম, তারপর যে যার দাম মিটিয়ে দিলাম। হিজ-হুজ, অনেকে বড় করে বলেন 'হিস-হিজ, হুজ-হুজ'।

আমেরিকায় এর একটা আলাদা নাম আছে। মার্কিনীদের যেমন সব ব্যাপারেই কাউকে একটু খোঁচা দেয়া। হোটেলে-রেস্তোরাঁয় খেয়ে যে যার দাম নিজে দিয়ে দেওয়াকে মার্কিনীরা বলে ডাচ-লাঞ্চ।

ডাচ মানে ওলন্দাজ। স্কটল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ডের লোকেদের মতো, ইহুদিদের মতো ওলন্দাজ অর্থাৎ হল্যান্ডবাসীদের কৃপণতার ব্যাপারে যৎকিঞ্চিত নাম বা সুনাম আছে।

ডাচ-লাঞ্চের নিমন্ত্রণ বিদেশে আমিও দুয়েকটি খেয়েছি। প্রথমবার, না জেনে না বুঝে দামি মেক্সিকান রেস্তোরাঁর মহার্ঘ খাদ্য প্রাণের আনন্দে ভরপেট খেয়েছিলাম। তারপর সেই সুখাদ্যের মূল্য যখন আমাকেই দিতে হল তখন আমার দু'চোখে জল। সে জল কতটা মেক্সিকান লঙ্কার ঝালের জন্য আর কতটা নির্বোধ অর্থব্যয়ের জন্য, সে হিসেবে যাব না।

আধাআধির এরকম বেদনাদায়ক কাহিনীর চেয়েও করুণতর একটি আখ্যান আমার আছে।

গল্পটা আমার পাঠকের কাছে পুরনো। কিন্তু আধাআধির গল্প হিসেবে খুবই দুঃখজনক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'ভাগাভাগি' নামে একটি গল্প এবং ঐ নামে একটি বই আছে আমার। এই মুহূর্তে এই রম্য নিবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে ফিফটি-ফিফটি নামে একটি হালকা লেখার কথাও মনে পড়ছে।

আধাআধি সংক্রান্ত বেদনাদায়ক কাহিনীটিরই নাম ফিফটি-ফিফটি।

তখন আমি আমাদের কালীঘাটের পুরনো বাড়িতে থাকি। নতুন চাকরি, সামান্য বেতন, যথেষ্ট দায়-দায়িত্ব। একেবারে যাকে বলে দিন আনি দিন খাই অবস্থা।

সেই সময়ে আমাদের গৃহভৃত্য ছিল রমেশ, পাকা চোর। সকাল বেলায় বাসায় কেউ নেই রমেশ ছাড়া, আমি টেবিলের ওপরে একটা দশ টাকার নোট রেখে বাথরুমে স্নান করতে গেছি। ফিরে এসে দেখি নোট উধাও। রমেশকে বললাম, 'তুই আমার দশ টাকার নোটটা নিয়েছিস?'

রমেশ যথারীতি অস্বীকার করল। বচসা থেকে হাতাহাতির উপক্রম। রমেশ টাকা দেবে না, আমিও ছাড়ব না। অবশেষে আমি নাছোড়বান্দা দেখে সে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে আমাকে দিয়ে বলল—ঠিক আছে ফিফটি-ফিফটি হয়ে যাক। এই পাঁচ টাকা আমার গচ্চা গেল, আপনারও দশ টাকার মধ্যে পাঁচ টাকা গেল।

বিবিধ (এক)

ধাঁধা

পুজোর মরশুমে চারদিকে নানারকম সভা, অনুষ্ঠান হচ্ছে। এ পাড়াতেও একটা অনুষ্ঠান সেদিন হয়ে গেল। পাশের পাড়ার গুড়ের আড়তদার, বিখ্যাত ব্যবসায়ী গৌরব গোলদার, এ পাড়ার পুজোয় পাঁচ হাজার পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তাঁকেই এই অনুষ্ঠানের সভাপতি করা হয়েছে।

প্রধান অতিথি হয়েছেন রমরমা পশারের উকিল বোকেন পালিত। চাঁদা দেওয়ায় এঁর খ্যাতিও কিছু কম নয়। গোলদারবাবু এবং পালিতবাবুর বদান্যতায় সংকট মুক্তি। এবং এর ফলে যা হয়েছে আশে পাশের অধিকাংশ পাড়ার যে কোনও অনুষ্ঠানে এঁরা দুজনেই ভাগেজোগে সভাপতি বা প্রধান অতিথি। গোলদারবাবু সভাপতি হলে বোকেনবাবু প্রধান অতিথি আবার বোকেনবাবু সভাপতি হলে গৌরব গোলদার প্রধান অতিথি।

সেদিনের অনুষ্ঠানে খুব হৈ-হট্টগোল। তুমুল বিশৃঙ্খলা। বোকেনবাবু বক্তৃতা করতে উঠেছেন, কিন্তু কি বলবেন, এত গোলমালের মধ্যে। তবে তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন, দু'বার গলা খাঁকারি দিয়ে মাইকে চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনারা ধৈর্য ধরুন। আমি বক্তৃতা করব না। আপনাদের শুধু একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করব।'

ধাঁধার কথায় সবাই চুপ হয়ে গেল। তখন বোকেনবাবু বললেন, 'আমি একজনের কথা বলছি। সে আমার বাবা-মার সন্তান। কিন্তু সে আমার ভাই নয়, বোনও নয়। বলুন তো সে কে?'

সবাই চুপ করে ভাবতে লাগল। তখন বোকেনবাবু বললেন, 'সে আমি নিজে।' তারপর জব্দ, নিঃশব্দ শ্রোতাদের ঝাড়া একঘন্টা বক্তৃতা শোনালেন।

বোকেনবাবুর কেরামতি দেখে গোলদার তাজ্জব। পরের সভায় নিজের বক্তৃতার সময় তিনি এই একই কেরামতি দেখালেন। বোকেনবাবু এবার সভাপতি, তিনি প্রধান অতিথি। সমবেত শ্রোতাদের তিনি ধাঁধাটি শোনালেন, 'একজন আমার বাবা-মায়ের সন্তান। কিন্তু তিনি আমার ভাই নন, বোনও নন, বলুন তো তিনি কে?'

যখন শ্রোতারা এই প্রশ্নের কিছু জবাব দিতে পারল না, তিনি পাশে উপবিষ্ট বোকেনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, 'তিনিই ইনি।'

গঙ্গারাম

গঙ্গারাম দু'দিনের ছুটিতে একটু বিশ্রাম নিতে দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিল। হোটেলে সে যে ঘরে উঠেছিল, তার পাশে পর পর কয়েকটি ঘরে একটি বড় পরিবারও বেড়াতে এসে উঠেছে। এদের সঙ্গে সাত-আট বছরের কয়েকটি ছেলে-মেয়ে আছে, প্রায় সমবয়েসী তারা, প্রচণ্ড গোলমেলে। হোটেলের বারান্দায়, সিঁড়িতে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করছে। এর-তার ঘরে অতর্কিতে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে দিচ্ছে।

এ ক'দিন গঙ্গারাম, এদের ভয়ে, ঘরে থাকলে সরাক্ষণ দরজা বন্ধ করে থেকেছে।

আজ দ্বিতীয় দিনে গঙ্গারাম কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগে একবার সমুদ্রস্নানে নেমেছে। সে তার জামাকাপড় এবং জুতো জোড়া সমুদ্রের ধারে বালির ওপরে রেখে বড় তোয়ালে পরে স্নান করতে নেমেছে।

একটু সাঁতরিয়ে, দুটো ডুব দিয়ে সমুদ্র থেকে ওঠার সময় দেখে, হোটেলের সেই বিপজ্জনক পরিবারটি দুর্দান্ত বালকদের সঙ্গে ঠিক যেখানে গঙ্গারাম জামা, কাপড়, জুতো রেখেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে।

সে দেখতে পেল একটি বালক তার জামাটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। অভিভাবকেরা নির্বিকার তাকিয়ে দেখছে।

গঙ্গারামের আর সহ্য হল না, সে ছুটে সামনের মহিলাকে বলল, 'ওই যে বাচ্চাটি আমার জামা সমুদ্রে ফেলে দিল, ও কি আপনার ছেলে?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'না না, ও আমার ছেলে নয়, আমার ছেলে নয়।'

গঙ্গারামের মুখে রাগে বিশেষ কথা যোগাচ্ছিল না, সে বলল, 'তা হলে?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তা হলে আর কি? ওই বাচ্চাটি আমার ভাসুরপো। ওই যে বাঁদিকে একটি ছেলে, ওই যে মাথায় স্ক্রু-কাট চুল, যে সমুদ্রে আপনার ডান পাটি জুতোটা ছুঁড়ে ফেলেছে, এখন বাঁ পাটিটা ছুঁড়ছে সে হল আমার ননদের ছেলে। আর, একটু দূরে ওখানে যে মেয়েটি আপনার প্যান্টটা বালিতে পুঁতছে সে হল আমার মেয়ে।'

সেলুন

পাড়ার চুলকাটার সেলুনে গিয়েছিলাম। বছরে মাত্র দুবার চুল কাটি। একবার ঘোর গরমে, আরেকবার ঘোর শীতে। দুবারেই আমার সারা বছরের কাজ চলে যায়।

এবারে কিন্তু আরও দেরি হয়ে গেল। ভরা শীতের মধ্যে বাইরে ছিলাম। অবশেষে আজ সকালেই চুল কাটলাম। মাথার বোঝা হালকা করে তারপর এই লেখা লিখতে বসেছি।

সেলুনের অভিজ্ঞতাটা আমার ভাল হয়নি। সবাই যেমন করে, সেলুনে ঢুকে পুরনো মুখ খুঁজছিলাম, অচেনা ক্ষৌরকারের হাতে এই দামি মাথাটা সঁপে দিতে ভয় হয়। চেনা-চেনা একজনকে দেখে বললাম, 'আগের বার কি আমি তোমার কাছেই চুল কেটেছি?'

যুবকটি অনেকক্ষণ আমার মাথার কেশগুচ্ছের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না স্যার।' আমি এই দোকানে মাত্র ছয় মাস এসেছি।' (অর্থাৎ, স্যার আপনি অন্তত ছয়মাস চুল কাটেননি।)

ভবিষ্যৎ

চিড়িয়াখানার খাঁচায় এক প্রান্তে মুখোমুখি বসে একটি বানর অন্য একটি বানরের হাত দেখছিল।

গভীর অভিনিবেশ সহকারে গণৎকার বানর অন্য বানরটির দুটি হাত উলটে পালটে দেখল। গণৎকারের মুখ খুব গম্ভীর। গণৎকারের মুখভাব দেখে দ্বিতীয় বানরটি শঙ্কিতভাবে খুবই দ্বিধাভরে প্রশ্ন করল, 'কেমন দেখলেন?'

গণৎকার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন, 'খারাপ। আপনার ভবিষ্যৎ খুব খারাপ।'

দ্বিতীয় বানরটি এই কথা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই খুব চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম খারাপ?'

গণৎকার বানরটি থেমে থেমে বললেন, 'কিছুদিনের মধ্যে আপনার লেজ খসে যাবে। ধীরে ধীরে আপনার সমস্ত লোম ঝরে যাবে। আপনার কোমর সোজা হয়ে যাবে।'

গণৎকার বানর আরও কি কি যেন বলতে যাচ্ছিল। ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভীত এবং চমকিত বানরটি বলল, 'তা কেন হবে?'

গণৎকার বলল, 'না হয়ে উপায় নেই। আপনার হাতে স্পষ্ট দেখলুম, আপনি শিগগিরই মানুষ হয়ে যাচ্ছেন।'

কমপিউটার

আমার এক সম্পর্কীয় ভাইঝি তুখোড় ছাত্রী, বৈদ্যুতিক অঙ্কশাস্ত্রে একেবারে এক নম্বর ধাপে।

গত শনিবার সন্ধ্যাবেলা সে এসেছিল। সে এসে বলল, 'আঙ্কেল, আমি একটা কমপিউটার কোম্পানিতে ভাল কাজ পেয়েছি।'

মম, ড্যাড, আঙ্কেল, হাজব্যাণ্ড শুনলে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। তবু ভাইঝিকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, 'তোমাদের কমপিউটার নিশ্চয় খুব.ভাল জাতের।'

ভাইঝি উৎফুল্ল মুখে বলল, 'এক কথায় বলা উচিত অসামান্য। মানুষ যা পারে না, কস্মিনকালেও পারেনি, সে সবই আমাদের এই কমপিউটার করে দেয়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে করে দেয়।'

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'তা হলে তোমাদের কমপিউটার মানুষের মতো চিন্তাভাবনাও নিশ্চয় করতে পারে?'

ভাইঝি একটু থমকে গিয়ে তারপর বলল, 'তা হয়তো নয়। কিন্তু কখনও কোনও ভুল করলে, ঠিক মানুষের মতো, সে ভুলটা অন্য কমপিউটারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।'

চাবি রহস্য

জীবনের বিচিত্র সমস্ত রহস্যের মধ্যে একটি হল চাবি রহস্য।

যে কোন চাবির রিংয়ে অন্তত একটি কি দুটি চাবি অচেনা থাকবেই। সেই চাবিটা ঠিক কোন তালার বা কোন আলমারির, কি করে এবং কবে ওই রিংয়ের মধ্যে এল, রিংয়ের মালিক হাজার চেষ্টা করেও এ রহস্যের সমাধান করতে পারেন না।
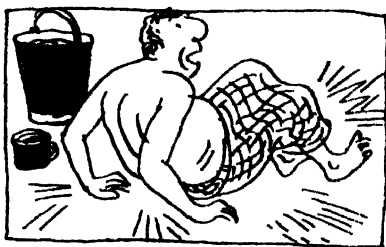
বিবিধ (দুই)

ছাপার অযোগ্য

একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হলে প্রশ্ন ওঠে, 'কি খবর?' অনেকে আবার শুধু খবর নয়, খবরাখবর জানতে চান, 'খবরাখবর কি?' দুটি জিজ্ঞাসায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে খবরের সঙ্গে অখবরও জানতে চাওয়া হয়েছে।

আমরা অখবর দিয়েই আরম্ভ করি। এই অখবরটি 'ছাপার অযোগ্য'। কাঁসিরাম এবং মায়াবতী এবং তাদের অনুচরেরা সাংবাদিকদের, ফটোগ্রাফার মহিলা সাংবাদিক নির্বিশেষে পিটিয়েছেন। তবে তার আগে এবং পেটানোর সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছেন। সাংবাদিকরা বলছেন, সেসব গালিগালাজ ছাপার অযোগ্য।

সাংবাদিকদের গালাগাল করার ব্যাপারে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদেরও যথেষ্ট দুর্নাম আছে। তিনিও অশ্রাব্য দেহাতি ভাষায় গাল দিতে অভ্যস্ত।

সংবাদ পড়ে জনসাধারণের কৌতূহল হতেই পারে। এঁরা ঠিক কি বলেন, বা বলেছেন যা ঘুরিয়ে ফিরিয়েও ছাপা যায় না। প্রকাশের অযোগ্য।

এইসূত্রে একটি আদালতীয় কাহিনী মনে পড়ছে। ভাড়াটে-বাড়িওয়ালার মামলা। ভাড়াটে অভিযোগ করলেন যে বাড়িওয়ালা তাঁকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করেছেন। স্বভাবতই আদালত জানতে চাইলেন, 'বাড়িওয়ালা আপনাকে কি কি বলেছেন?' ভাড়াটে হাত জোড় করে বললেন, 'সে হুজুর কোনও ভদ্রলোককে বলা যাবে না।' শুনে বিচারক বললেন, 'তাহলে আপনি এগিয়ে এসে আমার কানে কানে বলুন।'

শ্যাম লাহিড়ি বনগ্রামের

পর্ণকুটির থেকে রাজপ্রাসাদ, লগ কেবিন থেকে হোয়াইট হাউস, মার্কিন গণতন্ত্র নাকি সাধারণ নাগরিককে অসাধারণে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক বারই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে কৌলীন্যের প্রশ্ন ওঠে। বংশ লতিকা দেখে অনুসন্ধান করা হয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কে কতটা কুলীন। ভোটাররাও অনেকে এই

ভাবেই ভাবেন।

গবেষকরা খতিয়ে দেখেছেন বিল ক্লিন্টন এবং বব ডোলের মধ্যে ক্লিন্টনই অধিকতর কুলীন। ক্লিন্টন ফ্রান্সের রাজা প্রথম রবার্টের উত্তরপুরুষ। বৃটিশ রাজবংশের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ষোড়শ শতকের ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় হেনরি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে। বিলিতি এবং মার্কিনি খবরের কাগজে এই বংশ মর্যাদা নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলছে। আমার এ সব পড়ে সুকুমার রায়ের ছড়া মনে পড়ছে,

'কিন্তু তারা উচ্চঘর
কংস রাজের বংশধর।
শ্যাম লাহিড়ি বনগ্রামের
কি যেন হন গঙ্গারামের।'—

পারিবারিক

ভাত খেতে বসে টলটলে ডালের চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কিসের ডাল?'

মিনতি কটমট করে তাকাতে বললাম, 'মুগ না ছোলা, মটর না মুসুর, নাকি অড়হর?'

মিনতি বলল, 'একটু খেয়ে দেখো।'

স্ত্রী আজ্ঞা শিরোধার্য।

মিনতি বলল, 'কি ডাল মনে হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

মিনতি বলল, 'তা হলে কি ডাল, কিসের ডাল এসব প্রশ্ন করছো কেন?'

কাবুলিওয়ালা

কলকাতায় যেমন মুর্গিহাটা আছে, কাবুল শহরে তেমনি চিকেন স্ট্রিট। আমাদের খিদিরপুর ফ্যান্সি মার্কেটের মতো বিলাসদ্রব্য, আসল নকল বিদেশি জিনিসপত্র (মদ ছাড়া) পাওয়া যায়।

লণ্ডন টাইমসের খবর হল, যুদ্ধবিধ্বস্ত কাবুলে চিকেন স্ট্রিটের বাজার মোটেই বন্ধ হয়নি। এই বাজারের প্রধান আকর্ষণ হল হাতে বোনা কার্পেট। নগদ টাকা না দিয়ে চেক দিয়েও কেনা যায়। তবে ঠকানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। যদি চেক না ভাঙানো যায় ইউরোপ-আমেরিকার যেখান থেকেই পর্যটক আসুক, তার ঠিকানায় এক অনাবাসী কাবুলিওয়ালা অবশ্যই একদিন পৌঁছে যাবে বকেয়া টাকা আদায় করতে। কার্পেট দোকানিরা বলেছেন, 'আমাদের টাকা মারা যায় না। আমরা যারা কখনও না কখনও কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা ধার করেছি আমরা হাড়ে হাড়ে

জানি। কথাটা কত সত্যি।'

ভাইফোঁটা

দুদিন পরেই ভাইফোঁটা। ভাইফোঁটায় ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়ার সময় বোন যে মন্ত্রটি বলে, 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা' ইত্যাদি সেটাই আমার জ্ঞাতসারে একমাত্র নির্ভেজাল বাংলা মন্ত্র।

এই মন্ত্রটির মধ্যে অন্য একটা ব্যাপারও আছে। মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে যমুনা যেমন তার ভাই যমকে কপালে ফোঁটা দিয়ে অমর করেছিল, আমার ভাইও যেন তেমন অমর হয়।

ভাইয়ের কথা থাক। যমুনার ফোঁটায় যমরাজা যদি অমর না হতেন, তাহলে কি হত ভাবা যায়? যমরাজার মৃত্যুই হত শেষ মৃত্যু। তারপরে আর কখনও কেউ মরত না। জগৎসংসার চিরজীবী হত।

সেটা ভাল হত কি খারাপ হত?

অবশেষে

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। বিকেলবেলা অফিস থেকে ফিরে বড়বাবু বাথরুমে গিয়েছেন। হঠাৎ বাথরুমে দড়াম করে একটা শব্দ হল। বড় বৌদি রান্নাঘর থেকে সেই শব্দ শুনে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

বাথরুমের ভেতর থেকে বড়বাবু জানালেন, 'ও কিছু নয়। লুঙ্গিটা মেঝেতে পড়ে গেছে।'

বড় বৌদি অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি! লুঙ্গি পড়ার এমন সাংঘাতিক শব্দ?'

বড়বাবু জানালেন, 'লুঙ্গির মধ্যে যে আমি ছিলাম।'

পুনশ্চ :

অনেকদিন ভাল হাসিঠাট্টার ব্যাপার হয়নি। সকলের অনুমতি নিয়ে এবার একটু হাসিঠাট্টা হোক।

এক— গল্পটা সরাসরি বলছি।

চায়ের রেস্তোরাঁয় দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে। একজনের অত্যন্ত বিধ্বস্ত ভাব। বিধ্বস্ত বন্ধুকে অন্য বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে তোর হঠাৎ কি হল?'

বিধ্বস্ত বন্ধু বলল, 'কাল সন্ধ্যাবেলা খুব অপমানিত হয়েছি অনুরাধাদের বাড়িতে।'

'তোর সেই নতুন বান্ধবী অনুরাধা?' সঙ্গী বন্ধু প্রশ্ন করল, 'সে কি করল? তুই তো কাল বলেছিলি যে সন্ধ্যাবেলায় অনুরাধা তোকে তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে।'

'তাই তো গিয়েছিলাম', বিধ্বস্ত বন্ধু বলল।

এবার আবার প্রশ্ন, 'তাহলে কি হল?'

বিধ্বস্ত বন্ধু বলল, 'আর কি হবে? আমি বেল দিয়ে ওদের বাড়িতে ঢোকামাত্র হঠাৎ এক রাশভারি, মধ্যবয়সী মহিলা বেরিয়ে এলেন দেখে বুঝলাম অনুরাধার মা। তিনি আমাকে দেখেই মারমুখী হয়ে উঠলেন, আমার গলার কলার ধরে খেঁকিয়ে বললেন, 'এই ছোকরা তোমার মতলবটা কি বলতো?'

শ্রোতা বন্ধু বিস্মিত হয়ে বলল, 'আর তোর অনুরাধা? সে কিছু বলল না?'

বিপর্যস্ত বন্ধুটি কবুল করলেন, 'অনুরাধা বাড়ির মধ্যে ছিল। মায়ের গলা শুনে বেরিয়ে এসে আমার অবস্থা দেখে মাকে বলল, 'মা, তুমি ভুল করছো, ওকে ছেড়ে দাও, ও পরেশ নয়, পরেশ রাতের দিকে আসে, এই সময় নয়।'

দুই— দ্বিতীয় গল্পটা সেই বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটের পুরনো ব্যাপার। নাট্যাকারে লিখছি।

বাড়িওয়ালা : আপনি তো আগে প্রত্যেকদিনই নালিশ জানাতেন ঘরের দেয়ালের প্লাস্টার খুলে পড়ছে। এখন তো আর সে নালিশ মোটেই করেন না।

গোবেচারা ভাড়াটে : নালিশের আর কোনও প্রয়োজন নেই। দেয়ালের সব প্লাস্টার খসে পড়ে গিয়েছে। এখন আর কি করে খসবে?

বিদূষক (১)

বিদূষক মানে ভাঁড়, নানা রকম কৌতুক রসিকতা ইত্যাদি করে যিনি রাজার মনোরঞ্জন করেন। যেমন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে ছিলেন গোপাল ভাঁড়।

অবশ্য গোপাল প্রামাণ্য ঐতিহাসিক চরিত্র কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এটা কোন আনুমানিক সন্দেহ নয় সুপণ্ডিত সুকুমার সেন মহোদয় পর্যন্ত গোপাল ভাঁড়ের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন।

গোপাল ভাঁড়ের প্রসঙ্গে যথা সময়ে আসা যাবে, তার আগে এই প্রাচীন তথ্য

উত্থাপনের কারণটা বলি।

আমার তরলমতি সুবিদিত। এবার বিদেশে থাকাকালীন আমার এক পুরনো বন্ধু আমাকে কয়েকটি সরস গ্রন্থ পড়তে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি বই ছিল, জনৈক হুইটমোর গ্রন্থিত 'দ্য কোর্ট জেস্টারস' (The Court Jesters)। নামকরণের মধ্যে একটু বাহুল্য আছে, এখানে কোর্ট মানে রাজসভা। বইটির মানে দাঁড়ায় রাজসভার বিদূষক। বিদূষক মানেই রাজার সভাসদ, আলাদা করে রাজসভার বিদূষক বলার প্রয়োজন কি?

সে যা হোক প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সাবলীল ভাষায় লেখা এই বইটি আমার পক্ষে চমৎকার এই জন্যে যে আমার আবাল্য পরিচিত তিনজন বিদূষক, আরো সত্তর-আশি জন য়ুরোপীয় এবং এশীয় ভাঁড়ের সঙ্গে আলোচিত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মার্কিন লেখক, মার্কিন প্রকাশক কিন্তু কোন মার্কিন বিদূষকের সন্ধান পেলাম না।

এই বইতে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছেন মহামতি আকবরের সভাসদ বীরবল। ভাঁড়দের জগতে বীরবলের মতো শিক্ষিত, রুচিবান ব্যক্তি বিরল। তিনি শুধু সামান্য বিদূষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি ও দার্শনিক, সভাসদ ও সৈনিক। বুন্দেলখণ্ডের সামান্য ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান মহেশ চন্দ্র ভারতেশ্বরের রাজদরবারে বীরবল হয়েছিলেন।

পারস্য সম্রাট একদা শুনেছিলেন যে মোগল সম্রাটের পরশমণি আছে, যা ছোঁয়ালে সব কিছু সোনা হয়। তিনি নাকি পরশমণি সম্পর্কে আকবরের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন। আকবব পারস্যদূতকে বলেছিলেন, 'এই যে বীরবলকে দেখছেন, ইনি আমার পরশমণি।'

ঠিক এরই আগে একবার আকবর বীরবলকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'সূর্য উঠলে চারদিকে আলো হয়ে যায়। সব কিছু দেখা যায়। কিন্তু কি দেখা যায় না বলো তো বীরবল।'

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বীরবল বলেছিলেন, 'সূর্য উঠলে অন্ধকার দেখা যায় না।'

বীরবলের বুদ্ধিমত্তার একটি নিদর্শন রয়েছে তাঁর একটি অসামান্য উপদেশে।

মোগল সম্রাটের মা যেদিন পরলোক গমন করেছিলেন, ঠিক সেদিনই তাঁর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

সভাসদেরা জানেন না এমন অবস্থায় কি করতে হবে। আকবরের মুখোমুখি হলে হাসবেন না কাঁদবেন।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে তাঁরা বীরবলের শরণাপন্ন হলেন।

সব শুনে বীরবল যে পরামর্শ দিলেন, সেটা অদ্যাবধি শিরোধার্য।

বীরবল বলেছিলেন, 'সম্রাটের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। যদি দেখেন মহামতি হাসছেন, আপনিও হাসবেন। যদি দেখেন সম্রাটের চোখে জল, আপনারাও পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছবেন, চোখে জল থাক বা না থাক।'

আকবর একবার বীরবলকে পরিহাসচ্ছলে আগ্রার কাক গুনতে বলেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বীরবল কাক গোনা শেষ করে বললেন, 'আগ্রার কাকের সংখ্যা আশি হাজার তিনশো তিন।'

আকবর অবাক হয়ে বললেন, 'এ হিসেব বার করলে কি করে?' বীরবল মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'হঠাৎ কম বেশি হতে পারে। যদি কম হয় জানবেন কিছু কাক বাইরে গেছে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে কিংবা তীর্থ করতে। আর যদি বেশি হয় বুঝবেন, বাইরের কাকেরা আগ্রায় বেড়াতে এসেছে।'

পুনশ্চ :

একদা সম্রাট আকবর নাকি বীরবলকে সরাসরি বলেছিলেন, 'বীরবল তুমি বোকা, তুমি মুর্খ, তুমি গাধা।'

বীরবল বিনীতভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হুজুর আগে আমি এমন ছিলাম না, তা হলে আপনি আমাকে কখনোই সভাসদ করতেন না, মন্ত্রী করতেন।'

সম্রাট ভ্রূকুঞ্চন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে?'

একটু এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে একটু হাত কচলিয়ে বীরবল বললেন, 'সঙ্গদোষে আমার এই পরিণতি।'

হায়! আমরা যদি আমাদের ওপরওয়ালাদের এমন কথা কখনো বলতে পারতাম।
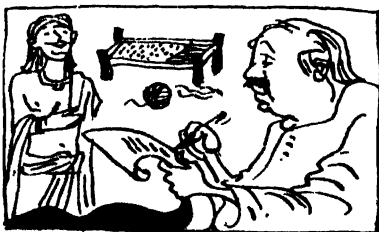
বিদূষক (২)

হুইটমোর সাহেবের কোর্ট জেস্টার বইতে বীরবল ছাড়াও, আমার এবং

আপনাদের সকলেরই, পূর্ব পরিচিত দু'জন বিদূষক আছেন।

গোপাল ভাঁড় এবং মোল্লা নাসিরউদ্দিন। গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে বেশি তথ্য নেই তবে সবিস্তারে মোল্লা নাসিরউদ্দিন কাহিনী আছে।

আগে গোপাল ভাঁড়ের কথাই বলি। পুরনো গল্প যথাসম্ভব এড়িয়ে যাচ্ছি।

কয়েকটা আধচেনা গল্প পেলাম। তার একটি হল কুকুর নিয়ে।

গোপাল নিয়মিত মন্দিরে পুজো দিতে যেতেন। একদিন তাঁর পিছু পিছু একটা পথের কুকুর মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছে।

মন্দিরের পুরোহিত কিঞ্চিৎ তফাতে আসছিলেন। তিনি পিছন থেকে এটা দেখে চেঁচিয়ে গোপালকে বললেন, 'গোপাল, তোমার কুকুরকে আটকাও, কুকুর নিয়ে মন্দিরের উঠোনে ঢুকবে না।'

গোপাল পিছন ফিরে দেখলেন সত্যিই একটা পথের কুকুর তাঁর পিছে আসছে আর আরেকটু পিছনে কুকুরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে মন্দিরের প্রধান পূজারি খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছেন।

গোপাল পূজারি ঠাকুরকে বললেন, 'কিন্তু ঠাকুরমশায়, আপনি কি করে বুঝলেন যে এই কুকুরটা আমার? আমি এই কুকুরের মালিক?'

ঠাকুরমশায় বললেন, 'কুকুরটা যে তোমার পিছনেই রয়েছে গোপাল।'

গোপাল বললেন, 'কি আর বলবো? আপনি কুকুরের পিছনে রয়েছেন। আপনার কথা মানলে বলতে হয় যে এই কুকুরটা আপনার মালিক, আপনি এর পিছে পিছে থাকছেন।'

বলা বাহুল্য, সাধারণ বাজার প্রচলিত গোপাল ভাঁড় কাহিনীতে এ গল্পটা ঠিক এভাবে আমি পাইনি।

অন্য একটি গল্প একটু অন্য রকম ভাবে রয়েছে।

সাধারণ মানুষ গোপাল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ নিযুক্ত হয়েছেন। সুতরাং তদানুযায়ী চলতে হবে।

নতুন ঘোড়া কিনতে হল গোপালকে। সুন্দর আরবি টাট্টু ঘোড়া। তার সঙ্গে রাজন্যজনোচিত লাগাম, চাবুক থেকে সাজপোশাক সাজসরঞ্জাম।

ঘোড়ার সঙ্গে নতুন সহিস এসেছে। তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গোপাল মনের সাধে ইচ্ছে মতো করে সাজপোশাকে ঘোড়া সাজালেন। নিজেই নিজেকে বাহবা দিতে লাগলেন।

কিন্তু আরবি ঘোড়ার উজবেক দেশিয় সহিস বলল, 'জাঁহাপনা, আপনার সব গোলমাল হয়ে গেছে, আপনি সামনের দিকের সাজ পিছনে পরিয়েছেন, পিছনের

সাজ সামনে। একদম উল্টো হয়ে গেছে।'

গোপাল উত্তেজিত হয়ে সহিসকে বললেন, 'উজবুক কাঁহাকা। তুই জানিস, আমি ঘোড়ার কোন দিকে মুখ করে বসবো। আমি ঘোড়ার লেজের দিকে মুখ করে বসবো, সেইভাবে সাজিয়েছি।'

হুইটমোর সাহেবের বইতে সভাসদ গোপালের সমাজ জীবনের আর একটা গল্প আছে।

সভাসদ হিসেবে গোপালের ওপরে দায়িত্ব পড়েছিল। রাজধানী কৃষ্ণনগরের অন্ধদের একটি তালিকা প্রণয়নের।

গোপাল লোকজন পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অন্ধের তালিকা তৈরি করেছিলেন। সেই তালিকা গোপাল তাঁর নিজের জামার পকেটে রাখতেন, যদি স্বচক্ষে কোনো অন্ধের দেখা পেতেন যার নাম ওই তালিকায় নেই তিনি ওই তালিকায় নামটি লিপিবদ্ধ করতেন।

তা, একদিন সকালে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে একটা গাছতলায় বসে গোপাল একটা পুরনো খাটিয়া মেরামত করছিলেন। সেই পথ দিয়েই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রাতঃভ্রমণে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর সভাসদের এই কাজ দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'গোপাল, তুমি কি করছো?'

গোপাল বললেন, 'আজ্ঞে খাটিয়া সারাচ্ছি।'

এরপর তাঁর জোব্বার পকেট থেকে অন্ধের তালিকাটি বের করে তাতে মহারাজের নামটি লিপিবদ্ধ করে আবার পকেটে রাখলেন।

কৌতূহলী মহারাজ বললেন, 'ওই কাগজটা কিসের?'

গোপাল বললেন, 'ওটা অন্ধের তালিকা।'

মহারাজ বললেন, 'ওটায় কি লিখলে?'

গোপাল বললেন, 'তালিকায় আপনার নাম অন্তর্ভুক্ত করলাম। আপনি পরিষ্কার দেখলেন আমি খাটিয়া সারাচ্ছি, অথচ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি করছি, আমার হিসেবে আপনি অন্ধ।'

বিদূষক (৩)

অবশেষে নাসিরউদ্দিন। হুইটমোর সাহেবের 'কোর্ট জেস্টার' বইতে যে নাসিরউদ্দিনের কথা বলা আছে, তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেককাল পরে, বলা উচিত, এই সেদিন।

সত্যজিত রায় নাসিরউদ্দিন রসিকতাসমুহ বাঙালি পাঠকের কাছে জনপ্রিয় করলেন। তারই অনতিকাল পরে ইন্দ্র মিত্র দেশ পত্রিকার পৃষ্ঠায় নাসিরউদ্দিনকে ধারাবাহিক করলেন। অবশ্য ইংরেজিতে নানা সংকলনে এবং আলাদা করেও নাসিরউদ্দিনের রঙ্গরসিকতা বেশ কিছুদিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছিল। পেপার-ব্যাকে প্রকাশিত হয়ে সেই বইগুলো বেশ সহজলভ্য হয়েছিল।

হুইটমোর 'কোর্ট জেস্টার' গ্রন্থে নাসির সংক্রান্ত অজস্র তথ্য এবং বহু গল্প আছে। গল্পগুলি অধিকাংশই বাঙালি পাঠকের পরিচিত।

আমি স্বল্পপরিচিত দু-একটি গল্পের কথা উল্লেখ করছি।

নাসির তখন শিশু। যেমন অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকে, তেমনই এক ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা কয় ভাই?'

নাসির বললেন, 'দুই'।

ভদ্রলোক বললেন, 'তোমাদের দু'জনের মধ্যে কে বড়?'

নাসির বললেন, 'সমান সমান।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ও তোমরা বুঝি দু-ভাই যমজ?'

নাসিরের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'না।'

কিছু বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে?'

এবার নাসির বুঝিয়ে বললেন, 'এক বছর আগে আমার মা বলেছিলেন যে আমার ভাই আমার চেয়ে এক বছরের বড়। এক বছর তো কেটে গেছে, এখন নিশ্চয়ই আমাদের দুই ভাইয়ের বয়স সমান-সমান হয়েছে।'

এই নাসিরই একদা বড় হয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহকে বলেছিলেন যে, 'আপনার মূল্য শূন্য।'

দোষটা বাদশাহেরই হয়েছিল, নাসিরের মতো ধুরন্ধর লোককে কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে, 'বলো দেখি আমি কত মূল্যবান?'

বাদশাহের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে তারপর মনে মনে কি হিসেব করে নাসির বললেন, 'কত আর মূল্য হবে আপনার, এই বড় জোর দশ মুদ্রা।'

বাদশাহ হো-হো করে হেসে বললেন, 'তুমি তো দেখছি আচ্ছা বোকা হে। আমার গায়ে এই জরির কাজ করা জামাটা দেখছো, এরই দাম হবে কমসে-কম দশ মুদ্রা।'

বিনীতভাবে নাসির বললেন, 'হুজুর, ওই জামাশুদ্ধই আপনার দাম ধরেছি।'

এর মানে হল, বাদশাহের মূল্য শূন্য। প্রগলভ এবং দুঃসাহসী নাসিরের এর পরে কি পরিণতি হয়েছিল হুইটমোর সাহেব সে বিষয়ে কিছু কিন্তু লেখেননি।

পরিণতির ভয় নাসির করতেন না। বীরবল বা গোপাল ভাঁড়ও করেননি। কি বললে কি হবে, একথা ভাবতে গেলে বিদূষকবৃত্তি করা যায় না। মন জুগিয়ে কথা বলে মো-সাহেবরা। তারা বিদূষকদের চেয়ে কয়েক ধাপ নিচের সারির লোক।

একবার বাদশাহ নাসিরের বাসায় হঠাৎ কিছু না জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন সামনের দরজা বন্ধ, বাড়ির মধ্যে নাসির তো নেই-ই, কেউ-ই নেই।

বাদশাহ পরিহাস করে চকখড়ি দিয়ে নাসিরের কাঠের দরজায় বড় বড় হরফে লিখে দিয়ে এলেন 'গাধা'। বাড়ি ফিরেই নাসিরের চোখে পড়ল সেটা।

পরদিন পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে স্বয়ং বাদশাহ তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন এ কথা শুনে নাসির ছুটলেন বাদশাহের প্রাসাদে। গিয়ে বললেন, 'হুজুর, আপনি আমার বাসায় গিয়েছিলেন, আমি ছিলাম না, আমি খুবই দুঃখিত।'

বাদশাহ মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি বুঝলে কি করে যে আমি গিয়েছিলাম?'

নাসির বললেন, 'তা বুঝবো না কেন হুজুর? আপনি যে আমার বাড়ির দরজায় অত বড় করে আপনার নাম লিখে রেখে এসেছেন।'

বিদূষক (৪)-গঙ্গারাম

বারবার তিনবার গঙ্গারামকে এড়ানো গেছে। এবার আর যাবে না। গঙ্গারামকে

ডাকতেই হবে। সে অবশ্যই, কোনও রাজরাজরার না হোক, মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত তারাপদ দেবশর্মনের বিদূষক।

কিন্তু গঙ্গারাম বিলক্ষণ চটে যাচ্ছে। আমি উপেক্ষা করলে আর সে অভিমান করবে না, সে হতেই পারে না।

গঙ্গারামকে খবর পাঠাই, সে জানায়, 'কেন, আমাকে আবার কেন? গোপালকে ডাকুন।' কখনও বলে, 'বীরবল কি ছুটিতে গেছে?' অথবা, 'নাসির মোল্লা পালালো কোথায়? স্টক ফুরিয়েছে বুঝি।'

অনেক সাধাসাধি, টেলিফোনে বহু অনুনয়-বিনয় অবশেষে টেলিফোনে বিরিয়ানি এবং চিকেন রেজালার লোভ দেখালেও—কিছুতেই গঙ্গারাম আসে না। শেষে একটি যন্ত্রস্থ রম্যরচনা গ্রন্থ তাকে উৎসর্গ করবো এই প্রলোভনে গঙ্গারাম আমার কাছে এলো।

আমার ঘরে ঢুকেই সামনের চেয়ারে বসে সে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রথমেই একটা গল্প বললো।

গল্পটা সেই গরু তাড়ানোর কৃষকের। সেই ব্যক্তি সারাদিন ঝোপে-ঝাড়ে, খেতে-মাঠে পলাতক গরুটির অনুসন্ধান করে গরুটি না পেয়ে ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় বসা নিজের ছেলেকে বলেছিল, 'ভাই এক গেলাস জল দাও তো।'

অদূরে রান্না ঘরে রন্ধনরত কৃষক পত্নী স্বামীর এই আচরণ, নিজের পুত্রকে ভাই বলা শুনে রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই। নিজের ছেলেকে ভাই বলছো।'

এই কথা শুনে কৃষক তার স্ত্রীকে মা সম্বোধন করে বলেন, 'মা, মানুষের গরু হারালে যে কি অবস্থা হয়, আপনি কি করে বুঝবেন।'

দুঃসাহসী গঙ্গারাম নির্জলা আমার বহু পুরনো গল্প আমাকেই শোনাল। গল্পটা বিস্তারিতভাবে কাণ্ডজ্ঞানের যুগে লিখেছিলাম, গল্পটা শুনেছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে।

গঙ্গারামকে এ কথা বলতে, সে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কার কাছে শুনেছিলেন?'

আমি বললাম, 'সেটা সুনীলকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তবে তার মনে আছে কি না বলতে পারব না।'

গঙ্গারাম তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটি পুরনো, হলদে হয়ে যাওয়া জীর্ণ গ্রন্থ বার করল। বেশ মোটা বই। বছর সত্তর আগে চিৎপুরের বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির নাম 'গোপাল ভাঁড় রহস্য লহরী'।

পেজ-মার্ক দেওয়া ছিল। নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলে গঙ্গারাম দেখাল সেখানে এই একই গল্প একটু দীর্ঘাকারে, সাধুভাষায় লেখা আছে।

দুই ঠোঁট কুঞ্চিত করে, পোষা কুকুরকে যে ভাবে ডাকে, সেই ভাবে চু-চু-চু করতে করতে গঙ্গারাম বলল, 'কেন যে আপনি ছাই-ভষ্ম এই সব হাসির লেখা লেখেন, সবই তো আগে লেখা হয়ে গেছে। আপনি ভাল করে পড়াশুনো করে আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে কিছু লিখুন তো।'

রীতিমত অপমানিত বোধ করছিলাম। গঙ্গারামকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। তাকে বললাম, 'আর কিছু বলার আছে?'

গঙ্গারাম বলল, 'হ্যাঁ আরেকটা গল্প। একটা সাংঘাতিক মোটা মতন লোক কোনও রকমে গড়াতে গড়াতে বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে গেছে নিজেকে দেখাতে। বিধান রায় অল্প একটু রোগীকে দেখে, অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বললেন, 'আপনার তো খুব খারাপ অবস্থা। ওষুধ, চিকিৎসায় আর কিছু হবে না। মাস দেড়েকের মধ্যে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।'

রোগীটি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে গেল। দেড় মাস পরে আবার সেই রোগীটি ডাক্তার রায়ের কাছে এসেছে, এই দেড়মাস প্রাণান্ত দুশ্চিন্তায় তার ওজন অর্ধেক হয়ে গেছে, ভুঁড়ি অদৃশ্য হয়েছে। চেহারা ছিমছাম হয়েছে, চলনে থলথলে ভাব নেই।'

রোগী এসে বিধান রায়কে বলল, 'আমার নির্ঘাৎ মৃত্যু, কিন্তু.....,' ডাক্তার রায় তাঁকে বলেছিলেন, 'মৃত্যুভয় দেখিয়েছিলাম তাতেই তো তুমি রক্ষা পেলে, নতুন জীবন ফিরে পেলে।'

আমি বললাম, 'এ গল্প তো সবাই জানে, এমন কি আমি নিজেও একবার লিখেছি।'

হাসতে হাসতে ঝোলা থেকে একটা বোর্ড বাউণ্ড ইংরেজি বই বার করে গঙ্গারাম বলল, 'নাসিরুদ্দিনের গল্পের এটা প্রামাণ্য সংকলন। এই গল্পটা এই বইতে রয়েছে।'